রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

[illegible] ভাগ। ১ম—৪র্থ সংখ্যা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

—::—

রঙ্গপুর

১৩৩৭

রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী।

---

১০ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
মনোমোহন প্রেস হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ যে যে রকমের কাজ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যত প্রকারের কাজ এই পরিষৎ এ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, সেরূপ কোন কাজ আমি করি নাই। আমার দৈনিক কাজের তালিকা অন্যবিধ। তা ছাড়া কখন কখন আমাকে যাহা করিতে হয়, তাহাও অন্য রকমের। এই কারণে আমি আপনাদের যাহা কাজ সেই রকম কাজ সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিব না। সেই সব বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করিয়া হয়ত কিছু লিখিতে পারিতাম; কিন্তু আমার যখন ঐ সকল বিষয়ের কোন সাক্ষাৎ স্থান নাই, তখন তৎসম্বন্ধে মৌন অবলম্বনই শ্রেয়ঃ। আমি সাহিত্য-রচয়িতাও নহি। সাহিত্যের ফেরিওয়ালার কাজ আমাকে করিতে হয় বটে। কিন্তু তাহার জন্য কোনও সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হইবার দাবী করা যায় না।

এই সকল কারণে, আপনাদের সভাপতি নির্ব্বাচন যথাযোগ্য হইয়াছে বলিতে পারি না। কিন্তু আপনারা যে আমাকে আপনাদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন তাহার জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

উত্তরবঙ্গ ও আসামে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্ক্রিয়া সম্পাদন; প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষি ও শিল্পনিচয় অধ্যয়ন, অনুশীলন ও চর্চ্চা; জেলার প্রাচীন বংশ সকলের ইতিহাস, এবং কবি ও অন্য কীর্ত্তিমান ব্যক্তিদের বৃত্তান্ত সংগ্রহ; দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রকাশিত পুস্তকাদি প্রকাশ; শিল্পাদির প্রাচীন নিদর্শন রক্ষা; এবং অন্যান্য নানা প্রকারে বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া আমাকে যে সকল পত্রিকা, পুস্তিকা ও কার্য্য-বিবরণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া এবং পরিষদ্‌ভবনে রক্ষিত পুঁথি, মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রাদি আজ প্রাতঃকালে দেখিয়া বুঝিয়াছি, পরিষৎ এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। সকল দিকেই পরিষদের কৃতিত্বের প্রমাণ রহিয়াছে। বস্তুতঃ, রঙ্গপুর যাহা করিয়াছে, বঙ্গের অল্প জেলাই তাহা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না—ইহা মনে করিলেও চলিবে না, একটা জেলার দ্বারা আর কি হইতে পারে? বাল্যকালে একটি শ্লোক পড়িয়াছিলাম, ঠিক্ মনে আছে কিনা জানিনা, তাহা এই :—

"অধোঽধঃ পশ্যতঃ কস্য মহিমা নোপচীয়তে।
উপর্য্যুপরি পশ্যন্তঃ সর্ব্ব এব দরিদ্রতি॥"

"আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট যাহারা তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার না মহত্ব প্রতীত হয়? কিন্তু যাহারা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ উর্দ্ধনেত্রে তাহাদের দিকে তাকাইলে সকলেরই দরিদ্রতা উপলব্ধ হয়।"

কোন্ কোন্ জেলা রঙ্গপুরের চেয়ে অকৃতী তাহা ভাবিলে চলিবে না। যাহারা অধিকতর কৃতী, তাহাদের কৃতিত্বের বিষয় চিন্তা করিয়া আরও অধিক কর্ম্মিষ্ঠ হইতে হইবে।

আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রস্থানীয় সূর্য্য অপেক্ষাও বৃহৎ ও জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্র আছে। সৌরজগতের অনেক গ্রহ আছে, যাহাদের তুলনায় আমাদের এই পৃথিবী ক্ষুদ্র। সেই পৃথিবীর অন্তর্গত এশিয়া মহাদেশের মধ্যে ভারতবর্ষ একটি দেশ। বাংলা তাহার একটি প্রদেশ। রঙ্গপুর তাহার একটি জেলা। এইরূপ ভাবিলে রঙ্গপুরকে অকিঞ্চিৎকর মনে হইতে পারে। কিন্তু অন্যদিকে যদি চিন্তা করা যায় যে, (কলিকাতা সমেত) বঙ্গের ২৮টি জেলার মধ্যে লোকসংখ্যায় রঙ্গপুর সপ্তমস্থানীয়, যদি ভাবা যায় যে, কেবল ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা ও বাখরগঞ্জ জেলায় ইহা অপেক্ষা বেশী লোক আছে, তাহা হইলে রঙ্গপুর যে অকিঞ্চিৎকর নহে, তাহা বুঝা যাইবে। আমাদের মন যদি ভারতবর্ষের বাহিরে ভ্রমণ করিয়া আসে, তাহা হইলে রঙ্গপুরের দ্বারা কত কাজ হইতে পারে ও হওয়া উচিত বুঝা যাইবে। এমন কতকগুলি স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন দেশ আছে, যাহাদের লোকসংখ্যা রঙ্গপুর জেলার চেয়ে কম বা কিছু বেশী। তাহাদের তালিকা নীচে দিতেছি।

ভূখণ্ডের নাম।	রাষ্ট্রীয় অবস্থা।	লোকসংখ্যা।
রঙ্গপুর	ব্রিটিশ শাসিত	২৫,০৭,৮৫৪
আলবানিয়া	স্বাধীন রাজ্য	১০,০০,০০০
ডেন্মার্ক	ঐ	৩৪,৩৫,০০০
ফিনল্যাণ্ড	সাধারণ তন্ত্র	৩৫,০০,০০০
এষ্টোমিয়া	ঐ	১১,১৬,০০০
আইরিশ ফ্রীষ্টেট	ডোমীনিয়ন	৩০,০০,০০০
লাটভিয়া	সাধারণ তন্ত্র	২০,০০,০০০
লিথুয়ানিয়া	ঐ	২০,০০,০০০
নরওয়ে	স্বাধীন রাজ্য	২৭,৮৯,০০০
নাজ্‌ড্‌ এবং হেজাজ	ঐ	১৫,০০,০০০
তিব্বত	সাধারণ তন্ত্র	৩০,০০,০০০
সাইবিরিয়া	ঐ	২০,০০,০০০
কোষ্টারিকা	ঐ	৫,৩২,০০০
গোয়াটিমালা	ঐ	১৬,০০,০০০

হণ্ডুরাস	ঐ	৬,৭৪,০০০
নিকারাগুয়া	ঐ	৬,৪০,০০০
সালভাডর	ঐ	১৬,৩৪,০০০
ডোমিনিকান	ঐ	৯,০০,০০০
হাইটি	ঐ	২৩,০০,০০০
বোলিভিয়া	ঐ	২৮,০০,০০০
ইকুয়াডর	ঐ	২০,০০,০০০
পারাগুয়ে	ঐ	৭,০০,০০০
উরুগুয়ে	ঐ	১৭,২০,০০০
ভেনেজুয়েলা	ঐ	৩০,২৭,০০০
নিউজিল্যাণ্ড	ডোমীনিয়ন	১৪,৬১,০০০
আণ্ডোরা	সাধারণ তন্ত্র	৬,০০০
লীক্টেনষ্টাইন	স্বাধীন সামন্ত রাজ্য	১২,০০০
লাক্সেম্বার্গ	ঐ	২,৭০,০০০
মোনাকো	ঐ	২৩,০০০
সানমারিনো	ঐ	১৩,০০০
পানামা	সাধারণ তন্ত্র	৪,৪২,০০০

এই সব দেশের অনেকগুলির সাহিত্যিক ও অন্যবিধ সভ্যজনোচিত নানা কীর্ত্তি আছে। এই সভায় তাহাদের নাম উল্লেখ কেন করিতেছি বলা দরকার। রঙ্গপুর জেলার কিম্বা বঙ্গের অন্য কোন জেলার লোকেরা ভাবিতে পারেন, আমরা মফঃস্বলের লোক, সংখ্যায় কয়েক লক্ষ মাত্র, আমাদের আর এমন কি বিশেষ করণীয় আছে? যাহা কিছু করিবার তাহা কলিকাতার লোকেরা বা অন্য কোন বড় জায়গার লোকেরা করিবে, তাহাতেই বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু মফঃস্বলের আমাদের ইহা ভাবা ভুল। বাঙালী যাঁহাদের গৌরব করিতে পারে, তাঁহাদের অধিকাংশ লোক মফঃস্বলে জন্মিয়াছিলেন এবং অনেকে বাসিন্দাও ছিলেন মফঃস্বলের। যেমন আধুনিক ভারতের প্রথম প্রধান জাতীয় জীবনের সকল বিভাগের কর্ম্মী রামমোহন রায়। তাঁহার এখানে কয়েক বৎসর বাসের ও আত্মীয় সভা আদি স্থাপনের গর্ব্ব রঙ্গপুর করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্যও আছে। তাঁহার লিখিত ও তাঁহার সম্পর্কিত বাংলা ইংরেজী আরবী পারসী উর্দ্দু ও হিন্দী যতকিছু পুস্তক পুস্তিকা চিঠিপত্র দলিল এই জেলার হিন্দু মুসলমান বাঙালী মাড়োয়ারী প্রভৃতির নিকট এবং সরকারী কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার সম্যক অনুসন্ধান এখনও হয় নাই। সেই অনুসন্ধান রঙ্গপুর পরিষদের করা ও করান উচিত। সে কথা ছাড়িয়া দিয়া এখন রঙ্গপুরের কথাই বলি। পৃথিবীর যে সব কৃতী স্বাধীন জাতির

দেশের উল্লেখ আগে করিয়াছি, তাহারাও ভাবে না আমাদের কিছু করিবার নাই, আমেরিকান ইংরেজ ফরাসী জার্ম্মাণ ইটালীয় জাপানী প্রভৃতিরা যাহা করে, তাহাই যথেষ্ট—তাহারা সংখ্যায় রঙ্গপুর জেলাবাসীদের প্রায় সমান হইলেও নিজেদের মনুষ্যত্বের উপর নির্ভর করিয়া কীর্ত্তিমান হয়। রঙ্গপুরের লোকেরাও মানুষ। তাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যাদি ক্ষেত্রে কেন অন্ততঃ পৃথিবীর সংখ্যান্যূন স্বাধীন সভ্য জাতিদের সমান কীর্ত্তিমান হইবেন না, তাহার কোনই কারণ নাই।

বাংলা সাহিত্যের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিক্ষিত যত বেশী লোক সাহিত্যের চর্চ্চা করে, এবং তাহার প্রসার ও উৎকর্ষ বৃদ্ধির চেষ্টা করে, এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনাও তত বাড়ে। পরিষদের অন্য যে-সব উদ্দেশ্য আছে, তাহাও শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে সিদ্ধ হইবার কথা। এই কারণে পরিষদের উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে এরূপ চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে প্রাপ্তবয়স্ক কোন পুরুষ বা নারী, এমনকি ৬।৭ বৎসরের শিশুও, লিখন পঠনে অক্ষম না থাকে। প্রাচ্যদেশের মধ্যে জাপানের এই সুদশা হইয়াছে। বাংলা দেশ ও রঙ্গপুর এই অবস্থা হইতে অনেক দূরে। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান প্রদেশে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের শিক্ষার অবস্থা নীচের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। ইহাতে ৫ বৎসর ও তাহার অধিক বয়সের পুরুষ ও স্ত্রীলোক হাজারে কতজন লিখন পঠন ক্ষম, তাহা দেখান হইয়াছে।

প্রদেশ।	পুরুষ ও স্ত্রীলোক।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
ব্রহ্মদেশ	৩১৭	৫১০	১১২
বঙ্গদেশ	১০৪	১৮১	২১
মান্দ্রাজ	৯৮	১৭৩	২৪
বোম্বাই	৯৫	১৫৮	২৪
বিহার-উড়িষ্যা	৫১	৯৬	৬
পাঞ্জাব	৪৬	৭৪	৯
আগ্রা-অযোধ্যা	৪২	৭৪	৭

ভারতীয় নৃপতিদের দ্বারা শাসিত কোন কোন রাজ্যে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ অপেক্ষা শিক্ষার বিস্তার অধিক হইয়াছে। যথা—

রাজ্য।	পুরুষ ও স্ত্রীলোক।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক
বড়োদা।	১৪৭	২৪০	৪৭
কোচিন	২১৪	৩১৭	১১৫
ত্রিবাঙ্কুড়	২৭৯	৩৮০	১৭৩

ত্রিবাঙ্কুড়, বড়োদা ও কোচিনের লোক সংখ্যা যথাক্রমে মোটামুটি একুশ, দশ ও চল্লিশ লক্ষ। ঐ তিন রাজ্যে শিক্ষার বিস্তৃতি যেরূপ হইয়াছে, রঙ্গপুরে শিক্ষার অন্ততঃ ততটা বিস্তৃতি শীঘ্রই হওয়া উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষা বিষয়ে রঙ্গপুর অনগ্রসর। ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে রঙ্গপুর লোক-সংখ্যায় বঙ্গের জেলাগুলি মধ্যে সপ্তম স্থানীয়; কিন্তু হাজার করা লিখন পঠন ক্ষম লোকের সংখ্যায় এই জেলা কেবল মাত্র জলপাইগুড়ি, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশ, রাজশাহী, মৈমনসিংহ ও মালদহের উপরে এবং অন্য সব জেলার নীচে। এখানে একটি কলেজ আছে বটে, কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪টি মাত্র। ইহার চেয়ে ছোট অনেক জেলায় এরূপ বিদ্যালয় বেশী আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় এ জেলায় কত ও অন্যান্য জেলাতেই বা কত, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

কোন জেলাতেই যে শিক্ষার অবস্থা সন্তোষজনক নহে, তাহার কারণ দেশের লোকেরা ও গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ পুরুষদের এবং পুরুষদের মধ্যেও কেবল কয়েকটি জাতির মধ্যে কিছু শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন। নারীদের শিক্ষার এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের শিক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা হয় নাই। বাংলা দেশে যাঁহাদিগকে ভদ্রশ্রেণীর লোক মনে করা হয়, তাঁহাদের সংখ্যা কম; অন্যজাতির লোকদের সংখ্যাই বেশী। বাঙালী জাতি বলিতে এই অল্পসংখ্যক লোকগুলিকে ধরিলে চলিবে না। সংখ্যায় অধিক অন্য জাতি সমূহের লোকদেরই বরং বাঙালী বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার বেশী। সেন্সস রিপোর্টে ও অন্য কোন কোন সরকারী রিপোর্টে এবং আমাদেরও কথাবার্ত্তায় কোন্ কোন্ জাতি ভদ্র তাহার নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু আমি তাহা করিব না। মানুষ স্বভাব চরিত্রে, আচরণে ও জ্ঞানবত্তায় ভদ্র হয়, বংশে অনুসারে নহে। বঙ্গ হিন্দুদের মধ্যে যে-সব জাতি সংখ্যায় পাঁচ লক্ষের অধিক তাঁহাদের তালিকা দিতেছি।

জাতি।	লোক সংখ্যা।
মাহিষ্য (চাষা কৈবর্ত্ত)	২২,১০,৬৮৪
নমশূদ্র	২০,০৬,২৫৯
রাজবংশী	১৭,২৭,১১১
ব্রাহ্মণ	১৩,০৯,৫৫৯
কায়স্থ	১২,৯৭,৭৩৬
বাগদী	৮,২৫,৩৯৭
গোয়ালা	৫,৮৩,৯৭০
সাহা	৫,৫৯,৭৩১
সদ্‌গোপ	৫,৩৩,২৩৬

মুসলমানদের মধ্যে শেখরা সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী—২, ৪৪, ১৪, ৬৩৬। সৈয়দরা মোটে ১, ৪০, ৪৯৯ এবং পাঠানরা ৩,০৬, ১৭৫।

শিক্ষায় মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অনগ্রসর বলিয়া যে সব জেলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী তথায় শিক্ষার বিস্তার কম দেখা যায়। হিন্দুদের মধ্যে সংখ্যায় খুব বেশী যে তিনটি জাতি তাহাদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার কম হইয়াছে। এইজন্য যে সব জেলায় এই জাতির লোকদের সংখ্যা বেশী, সেখানে শিক্ষার বিস্তার কম হইয়াছে।

বাংলাদেশে সব জাতি ও ধর্ম্মের লোক একত্র ধরিয়া দেখা যায় ৫ বৎসর ও তদধিক বয়সের লোকদের মধ্যে হাজারে ১০৪ জন লিখন পঠনক্ষম—হিন্দুদের মধ্যে ১৫৮, মুসলমানদের মধ্যে ৫৯। হিন্দু সব জাতিদের মধ্যে বৈদ্যদের ৫ বৎসর ও তদধিক বয়সের হাজার করা ৬৬২ জন লিখনপঠনক্ষম, ব্রাহ্মণদের ৪৮৪, কায়স্থদের ৪১৩, সুবর্ণ বণিকদের ৩৮৩, গন্ধবণিকদের ৩৪৪, সাহাদের ৩৪২; কিন্তু সংখ্যায় অধিকতম মাহিষ্য, নমশূদ্র ও রাজবংশীদের যথাক্রমে কেবল ১৩১, ৮৫ ও ৬৫ জন মাত্র। মুসলমান সংখ্যা ভূয়িষ্ঠ শেখদের মধ্যে এই সংখ্যা ৫৭ জন।

রঙ্গপুর জেলার ২৫,০৭,৮৫৪ জন লোকের মধ্যে হিন্দু ৭, ৯১, ১৪৩, মুসলমান ১৭,০৬, ১৭৭। মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রঙ্গপুরের শিক্ষা বিষয়ে অনুন্নত হইবার একটি কারণ। হিন্দুদের মধ্যে যে সব জাতি শিক্ষায় অগ্রসর, রঙ্গপুর জেলায় তাহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম; যাহারা অনগ্রসর তাহাদের সংখ্যা বেশী। যথা—

জাতি।	লোকসংখ্যা
বৈদ্য	২, ১১৪
ব্রাহ্মণ	১৫, ৬৯৮
কায়স্থ	১৩, ১৮৮
সুবর্ণবণিক	১৯৩
গন্ধবণিক	৯৪০
মাহিষ্য	১৭. ৭৪৮
নমশূদ্র	৩৮, ৪২৬
রাজবংশী	৪, ৬১, ৩৭৪

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সকল উদ্দেশ্য ক্রমশঃ অধিকতর উৎসাহ ও সাফল্যের সহিত চালাইতে হইলে এই জেলায় ক্রমশঃ দ্রুত শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। তাহার অর্থ এই যে, সমুদয় বালিকা ও নারীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, সংখ্যায় অধিক মুসলমানদের মধ্যে খুব শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে, এবং হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূত সংখ্যাবহুল অথচ শিক্ষায় অনুন্নত রাজবংশী, নমশূদ্র ও মাহিষ্য প্রভৃতি জাতির শিক্ষার প্রতি বিশেষ করিয়া মন দিতে হইবে। যিনি যে ধর্ম্মের বা জাতির লোক, তিনি কেবল সেই ধর্ম্মের বা জাতির লোকদের শিক্ষায় মন দিবেন, এরূপ সংকীর্ণ মনোভাব লইয়া কাজ করিলে চলিবে না—সকলকে সকলেরই কল্যাণ চিন্তা করিতে হইবে। রঙ্গপুরের পরলোক-

গত ও জীবিত জনহিতৈষী ব্যক্তিগণের কার্য্য মনে রাখিলে আশা করা যাইতে পারে যে, সমুদয় জেলা শিক্ষায় উন্নত হইতে পারিবে।

সম্পূর্ণ অসভ্য দেশের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা যদি সাহিত্যের প্রসার উৎকর্ষ ও চর্চ্চা বাড়াইবার কথা উঠে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা শীঘ্র ফললাভের আশা হয় ত পোষণ করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরাও সাহিত্য রসাস্বাদ হইতে এবং সামাজিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত নহে। যাত্রার দ্বারা, কীর্ত্তন দ্বারা, কথকতা দ্বারা, পুরাণ পাঠ ভাগবত পাঠ রামায়ণ পাঠ ও গান প্রভৃতির দ্বারা আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও সামাজিক শিক্ষার ও সাহিত্য রসের আস্বাদ দিবার ব্যবস্থা থাকায় লোকদের মন অনেকটা প্রস্তুত হইয়া আছে। এরূপ প্রস্তুত ক্ষেত্রে সুশিক্ষার বীজ পড়িলে তাহা হইতে যে প্রভূত সাহিত্যিক ফসল লাভ করা যাইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইলে সকল শ্রেণীর লোকদের ভাব ও চিন্তা দ্বারা, অভিজ্ঞতা দ্বারা সাহিত্য পুষ্ট হয়। তাহাতে তাহার গভীরতা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমানের বাংলা সাহিত্য প্রধানতঃ "ভদ্রলোক" বলিয়া পরিচিত শ্রেণীর লোকদের রচিত সাহিত্য। নিম্নশ্রেণীর লোকদের সাক্ষাৎভাবে অনুভূত সুখ দুঃখের সান্ত্বনার ও শক্তির কথা, তাহাদের ত্যাগ আত্মোৎসর্গ সহিষ্ণুতা ও সাহসের কথা ইহাতে কম আছে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হইলে সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্য হইতে কত প্রতিভাশালী লোকের উদ্ভব হইতে পারে, ইংরেজী ও অন্য পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শেক্সপীয়ার কসাইয়ের ছেলে, কীট্‌স্ আড়গড়ার সহিসের পুত্র, বার্ণস্ চাষার ছেলে ও স্বয়ং চাষা, জর্জ মেরিডিথ দরজির সন্তান এবং টমাস হার্ডি রাজমিস্ত্রীর ছেলে ছিলেন। আমাদের দেশেও গভীর দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ অনেক বাউলের গানের অজ্ঞাতনামা রচয়িতারা যে নিম্নশ্রেণীর লোক ছিলেন এবং হয়ত নিরক্ষর ছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে।

বড় বড় জাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশগুলির বৃত্তান্ত পড়িলে দেখা যায়, যে, তাহাদের অনেকগুলিতে সকল বালক বালিকার অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আমি পূর্ব্বে যে দেশগুলির তালিকা দিয়াছি, তাহার অনেকগুলিতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইলে তদ্রূপ সরকারী ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমরা স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রম দ্বারা নিজেরাও অনেক লোককে শিক্ষা দিতে পারি এবং তাহা দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। কারণ, আমরা আমাদের শিক্ষার জন্য দেশের নিরক্ষর দরিদ্র লোকদের নিকট ঋণী, সাধারণ শিক্ষা এবং শিল্প কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষার উপর দেশের ধনবৃদ্ধি নির্ভর করে। আবার দেশে ধন না থাকিলে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইতে পারে না, পুস্তক প্রকাশ ও ক্রয়ের ক্ষমতাও থাকে না, সুতরাং সাহিত্যের উন্নতিও হয় না। এইজন্য সকল রকম শিক্ষাদানের চেষ্টা যেমন করিতে হইবে,

অর্থাগমের উপায় অবলম্বনও তেমনি সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। গুজরাতী যাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের সংখ্যা এককোটিও নহে। কিন্তু তাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী বলিয়া তাহাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ।

০ ০

সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারবৃদ্ধির সহিত শিক্ষার বাহনের সাক্ষাৎ সম্পর্ক আছে। বিদেশী ভাষার সাহায্যে যাহা শিখা যায়, তাহা অধিকাংশ স্থলে অস্থি মজ্জাগত হয় না, তাহাতে অধিকাংশস্থলে জ্ঞানের গভীরতা জন্মে না ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায় না। বিদেশী ভাষার সাহায্যে যে বয়সে যত জ্ঞান লাভ করা যায়, মাতৃভাষার সাহায্যে সেই বয়সে তাহা অপেক্ষা বেশী জ্ঞান লাভ করা যায়। আমরা ১০।১১ বৎসর বয়সে বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিবার সময় ইতিহাস ভূগোল গণিত ও বিজ্ঞান যাহা জানিতাম, তাহা ইংরেজী স্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর ১৫।১৬ বৎসরের ছাত্রদের জ্ঞানের চেয়ে কম নয়। কারণ, আমরা শিখিয়াছিলাম, মাতৃভাষার সাহায্যে; ইংরেজী স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইত (এখনও অধিকাংশ স্থলে হয়) ইংরেজীর সাহায্যে। মাতৃভাষার সাহায্যে যে যে বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা যেখানে যেখানে হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, বাংলার সাহায্যে ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিলে ছাত্রেরা ইংরেজীতে কাঁচা থাকিয়া যাইবে। তাহা অবশ্যম্ভাবী নহে, ইংরেজী সুপ্রণালী অনুসারে শিখাইলে অল্প সময়েই ভাল শিখা যায়; ইহাও মনে রাখা দরকার, যে শুদ্ধ ইংরেজী বলা ও লেখা অপেক্ষা নানা বিষয়ের বিশুদ্ধ গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞান লাভ বেশী আবশ্যক। জাপানীরা আমাদের মত ইংরেজী বলিতে ও লিখিতে পারে না; কিন্তু তাহাদের জ্ঞান ও শক্তি এবং জাতি সংঘের মধ্যে তাহাদের সম্মান আমাদের চেয়ে কম নয়। আমি ভুল ইংরেজী বলা ও লেখার পক্ষ সমর্থন করিতেছি না—যাহা করিতে হইবে তাহা ভাল করিয়া করাই উচিত। কিন্তু ইংরেজদের মত ইংরেজী বলিবার ও লিখিবার চেষ্টা করিতে গিয়া শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যে জ্ঞানলাভ, বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত করা ও চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি করা. তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়।

শিক্ষার বাহন মাতৃভাষা না হইলে সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। উচ্চ শিক্ষা যদি মাতৃভাষার সাহায্যে হয়, তাহা হইলে বিদ্যার সকল শাখা সম্বন্ধীয় পুস্তকও মাতৃভাষায় লিখিতে হইবে; তাহাতে মাতৃভাষার শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি পাইয়া তাহা ও তাহার সাহিত্য পুষ্ট হইবে। উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষার ভিতর দিয়া হইলে আমরা চিন্তা করিব মাতৃভাষায়, অনুভব করিব মাতৃভাষায়। তাহার ফলে আমাদেরও সাহিত্যে উন্নতি হইবে। এখন আমরা অনেক বিষয়ে চিন্তা করি ইংরেজীতে, এবং সেই চিন্তা বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি। উচ্চ শিক্ষা বাংলার ভিতর দিয়া না হইলেও কবিতা, উপন্যাস, নাটক, গল্প লেখা যাইতে পারে বটে; কিন্তু যদি আমাদের বর্ত্তমান যুগের চিন্তা ও ভাব তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে হয় তাহা হইলে অনেক স্থলে হয় আমাদিগকে ইংরেজীতে চিন্তা ও

অনুভব করিয়া লিখিবার সময় তাহার বাংলা অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, নতুবা বাংলাতেই চিন্তা ও অনুভব করিয়া বাংলায় লিখিতে হইবে।

জড় বিজ্ঞানের প্রভাবও আধুনিক পাশ্চাত্য সুকুমার সাহিত্যে অনুভূত হয়। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ যদি জড় বিজ্ঞানও মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে বাংলাভাষা ত পুষ্ট হইবেই, অধিকন্তু পরোক্ষ ভাবে বাংলা কাব্য সাহিত্যেও হইবে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক নিরক্ষর, অল্প সংখ্যক লোক মাতৃভাষায় লিখন পঠনক্ষম, কতকগুলি লোক ইংরেজীতেও লেখা পড়া করিয়াছেন। ইংরেজী জানা লোকদের মনের গতি এবং চালচলন শুধু বাংলা জানা লোকদের এবং নিরক্ষর লোকদের মনের গতি ও চালচলন কতকটা ভিন্ন রকমের। তাঁহারা যেন আর কোন দেশের মানুষ। সকল শ্রেণীর সকল লোকের শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে হইলে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যের পরিপন্থী এই প্রভেদ দূর হইতে পারে, ইংরেজী জানা লোকদের অহঙ্কারের ভাব নষ্ট হইতে পারে, তাহা না হইলে জাতীয় ও সামাজিক সম্যক্ কল্যাণ সাধিত হইবার নহে।

পৃথিবীতে যত জাতির ভাষা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন, বিস্তৃত ও গভীর, তাহাদের সকলের শিক্ষাই মাতৃভাষার সাহায্যে হইয়া থাকে। অবশ্য, তাহারা মাতৃভাষা ভিন্ন অন্ততঃ অন্য একটি আধুনিক ভাষাও শিখিয়া থাকে। কেহ কেহ দুটিও শিখে। তা ছাড়া, অনেকে প্রাচীন গ্রীক লাটিনও শিক্ষা করে। অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র সংস্কৃত শিখে, বাংলা দেশে শিক্ষা যদি কাল ক্রমে বাংলায় হয়, তাহা হইলেও আমরা ইংরেজী ও অন্য কোন পাশ্চাত্যভাষা শিখিতে থাকিব। পৃথিবীর সহিত যোগ রাখিবার জন্য ইহা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন, মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মানসিক উন্নতির জন্য কোন একটি ভাষাই যথেষ্ট নহে।

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করি তাহা বজায় রাখিবার জন্য, আরও জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এবং নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত সাহিত্যের চর্চ্চা আবশ্যক, কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই আর্থিক অবস্থা এরূপ নহে, যে, তাহারা নিজে যত বহি পড়িতে চায়, সবই কিনিয়া পড়িতে পারে। প্রত্যেকের বাড়ীতে এত বহি রাখিবার জায়গাও নাই। এই জন্য সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন। কোন্ জাতি কিরূপ সাহিত্যের চর্চ্চা করে, তাহা তাহাদের লাইব্রেরীর সংখ্যা এবং তৎ-সমুদয়ের পুস্তক সংখ্যা হইতে অনুমান করা যায়। লাইব্রেরীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি ভিন্ন দেশব্যাপী সাহিত্যের চর্চ্চা সম্ভবপর নহে। বিখ্যাত বড় বড় জাতির দৃষ্টান্ত না লইয়া আমি একটি ক্ষুদ্র জাতির দৃষ্টান্ত হইতে দেখাইব, উন্নত ও অগ্রসর জাতিরা লাইব্রেরী জিনিষটিকে কিরূপ আবশ্যক মনে করে। সুইট্জারল্যাণ্ডের লোক সংখ্যা উনচল্লিশ লক্ষের কিছু অধিক; বঙ্গের মৈমনসিংহ জেলা অপেক্ষা কম, রঙ্গপুরের দেড়গুণের কিছু বেশী। ১৯১১ সালে অর্থাৎ উনিশ বৎসর পূর্ব্বে সুইস্ জাতির এই দেশে ৫৭৯৮টি লাইব্রেরীতে ৯৩,৮৫,০০০ খানি বহি

ছিল; অর্থাৎ জন প্রতি ২½ খানি বহি ছিল। সে হিসাবে রঙ্গপুরে ন্যূনকল্পে ৩৬০০ লাইব্রেরী ও তাহাতে ৬০ লক্ষ বহি থাকা উচিত; —বাস্তবিক কত আছে জানি না, আপনারা বলিতে পারিবেন। সুইট্‌জাল্যাণ্ডের লাইব্রেরীগুলির সংখ্যা ও তৎসমুদয়ের পুস্তকের যে সংখ্যা দিলাম, তাহা উনিশ বৎসর আগেকার। এখন উভয়ই বাড়িয়াছে।

পাশ্চাত্য অনেক দেশে শিক্ষা সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া সাধারণ মুটে মজুর কারিগর চাকর চাকরাণীরাও সাহিত্য-চর্চ্চা করে। সুইট্‌জারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত হইতে, এবং আরও ভাল করিয়া রুশিয়ার দৃষ্টান্ত হইতে তাহা বুঝা যায়। আমরা সকলেই শুনিয়াছি, রুশিয়া এখন হোমরা চোমরা অভিজাত বংশের লোক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের দ্বারা শাসিত হয় না; এখন তথায় শ্রমিক ও কৃষকদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা আমাদের দেশের মুটে মজুর চাষাদের মত অশিক্ষিত নহে,যদিও নৈতিক কোন কোন বিষয়ে তাহারা আমাদের নিরক্ষর লোকদের চেয়ে নিকৃষ্ট হইতে পারে। তিন বৎসর আগেকার কথা বলিতেছি, রুশীয় সাধারণতন্ত্র সমূহে হাজার করা ৬১৭ জন পুরুষ ও হাজার করা ৩৩৬ জন স্ত্রীলোক লিখনপঠনক্ষম ছিল। ভারতবর্ষে লিখনপঠনক্ষম পুরুষ ও স্ত্রীলোক হাজার করা যথাক্রমে ১৩৯ ও ২১; রঙ্গপুরে ১২১ ও ৭। রুশিয়ার সাধারণ বঙ্গে ১৮০ ও ২১, শ্রমিকরাও কিরূপ লেখাপড়ার চর্চ্চা করে, তাহা তাহাদের শ্রমিক সংঘ (Trade-union) গুলির লাইব্রেরী হইতে বুঝা যায়। তাহাদের ৬৮০৭টি লাইব্রেরী আছে এবং তাহাতে মোট ৮৪,১৪,০৪০ খানি বহি আছে। তদ্ভিন্ন তাহারা সংবাদপত্র প্রকাশ ক্রয় ও পাঠ করে। তাহারা ১৯২৫ সালে ২৫টি খবরের কাগজ বাহির করিত; তাহার মধ্যে ছয়টি দৈনিক। ৮৩ খানি মাসিকও তাহারা প্রকাশ করিত। ইহা ছাড়া বুলেটিন, দেওয়াল-সংলগ্ন সংবাদপত্র ইত্যাদিও আছে। তাহাদের খবরের কাগজগুলির মোট কাট্‌তি ৯,৮১,২৭৫ এবং মাসিক-গুলির ৯,০৭,৬০০। ইহা শুধু শ্রমিক সংঘসমূহের কাগজগুলির, অন্য সব কাগজের নয়। রুশিয়ার শ্রমিকসংঘ অনেক বহিও প্রকাশ করে। ১৯২৪ সালে তাহাদের বহিগুলির ১০,৪১,০০০ খণ্ড মুদ্রিত হয়। ইহা ভিন্ন কৃষকদের কাগজ ও বহির এইরূপ কাট্‌তি আছে।

সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং লাইব্রেরীর সুবিধা বিষয়ে ভারতবর্ষেই আমাদের অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত আছে। বরোদা রাজ্যের লোকসংখ্যা ১৯২১ সালের সেন্সস অনুসারে ২১,২৬,৫২২—রঙ্গপুর জেলা অপেক্ষা চারি লক্ষ কম। ইহার কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে ১৯২৯ সালের জুলাই মাসে ৯১,১২৪ খানি বহি ছিল। তদ্ভিন্ন এই রাজ্যের সহরগুলিতে ৪৫টি এবং গ্রামসমূহে ৬৭৮টি লাইব্রেরী ঐ সময়ে ছিল। বরোদা রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে শতকরা ৬৩ জন লাইব্রেরীর সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে, ৩৭ জন পারে না; সহরবাসীরা সকলেই এই সুবিধা পাইতে পারে; গ্রামের লোকদের শতকরা ৫৩ জন পারে, ৪৭ জন পারে না। কেন্দ্রীয়, নাগরিক ও গ্রাম্য লাইব্রেরী ছাড়া বরোদা রাজ্যে "ভ্রাম্যমান" লাইব্রেরী আছে।

৩৭৭টি লাইব্রেরী বাক্স দ্বারা এই কাজ হয়॥ তাহাদের মোট পুস্তক সংখ্যা ১৮,০৯৮। নাগরিক লাইব্রেরীগুলিতে মোট ২,১৬,৭০৫ খানি বহি আছে।

শুধু লাইব্রেরী থাকিলেই হইবে না; পাঠের অভ্যাস চাই। পাঠের অভ্যাসের মত মূল্যবান্ অভ্যাস কমই আছে। ইহা হইতে শোকে সান্ত্বনা, অবসাদে স্ফূর্ত্তি, নৈরাশ্যের মধ্যে আশা, অন্ধকারে আলোক, দুর্ব্বলতার মধ্যে বল ও দুঃখের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায়; মুহূর্ত্তের মধ্যে নিভৃতে সকল দেশের সর্ব্বকালের যে-কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গ পাওয়া যায়। লাইব্রেরীর সম্পর্কে মধ্যে মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখকদিগের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠাদির দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পাঠের অভ্যাস জন্মাইবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

শিক্ষার বিস্তৃতি দ্বারা সাহিত্যের প্রসার-বৃদ্ধি ও উন্নতি করিতে হইলে শুধু বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীদের শিক্ষায় মনোযোগী হইলেই চলিবে না; অধিকবয়স্ক নিরক্ষর স্ত্রীলোক ও পুরুষদের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। বাংলাদেশে এই কাজ সামান্য ভাবে কোথাও কোথাও নৈশবিদ্যালয়গুলির ও অন্তঃপুর-শিক্ষার দ্বারা হয়; রঙ্গপুরেও হয়ত নৈশবিদ্যালয় ও অন্তঃপুরশ্রেণী কয়েকটি আছে। কিন্তু অধিক বয়স্ক লোকদের শিক্ষার প্রচেষ্টা দেশব্যাপী করা আবশ্যক। নতুবা নিরক্ষরতা শীঘ্র দেশ হইতে দূরীভূত হইবে না এবং সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি ও উন্নতিও শীঘ্র হইবে না। রুশিয়ায় এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে এবং তাহার ফলও ইতিমধ্যেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দেশের অধিক বয়স্ক নিরক্ষর লোকদের বিদ্যালয় সমূহে ১৯২৪-২৫ সালে ২১,৫০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ছিল; ১৯২৫-২৬ সালে ছিল ১৫,৯৯,৭৫৫। ইহার মানে এই যে, এক বৎসরের মধ্যে ৫,৫০,২৪৫ জন নিরক্ষর পুরুষ ও স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে শিখিয়া ঐ সব স্কুল ছাড়িয়া গিয়াছিল।

আমি এতক্ষণ প্রধানতঃ শিক্ষাবিস্তারের পথ দিয়া ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির প্রণালীর আলোচনা করিয়াছি। এখন এ বিষয়ে অন্য কতকগুলি উপায়ের কথা বলিব। পৃথিবীর লোকসংখ্যা ১৮৫ কোটি বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সাড়ে সাত চল্লিশ কোটি ইউরোপ বাস করে। কিন্তু ইউরোপের কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাষা ইউরোপের বাহিরেও অনেকে মাতৃভাষা রূপে ব্যবহার করে বলিয়া, কেবল ঐ কয়টি ভাষাতেই পৃথিবীর সাড়ে পঞ্চান্ন লোক কথা বলে। যথা :—

ইংরেজী ভাষায়	১৬,০০,০০,০০০ জন
জার্ম্মাণ ভাষায়	১০,০০,০০,০০০ জন
রুশীয় ভাষায়	১০,০০, ০,০০০ জন
ফরাসী ভাষায়	৭,০০,০০,০০০ জন
ইতালীয় ভাষায়	৫,০০,০০,০০০ জন
স্পেনীয় ভাষায়	৫,০০,০০,০০০ জন
পোর্ত্তুগীজ ভাষায়	২,৫০,০০,০০০ জন

যে-যে দেশে এই ভাষাগুলির উৎপত্তি রুশিয়া ছাড়া তাহাদের লোকসংখ্যা এত নয়; ইহা অপেক্ষা কম। যথা :—

দেশ	লোকসংখ্যা
ইংলণ্ড	৩,৫৬,৭৮,৫০০
জার্ম্মেণী	৬,২৫,০০,০০০
রুশিয়া	১৩,৬০,৫০,০০০
ফ্রান্স	৪,০০,৭০,০০০
ইতালী	৩ ৮১,০০,০০০
স্পেন	২ ১৩,৫০,০০০
পোর্ত্তুগ্যাল্	৬০,০০,০০০

রুশিয়ায় রুশীয় ছাড়া অন্য অনেক ভাষা প্রচলিত।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যে, যে-যে দেশে ঐ সকল ইউরোপীয় ভাষায় উৎপত্তি, তাহা অতিক্রম করিয়া অন্যান্য বহুদেশে তাহাদের প্রচলন কি প্রকারে হইল। সেই বিষয়টির আলোচনার পূর্ব্বে দেখা যাক্ ভারতবর্ষের কোন্ ভাষায় কত লোক কথা বলে প্রধান ভাষাগুলিরই হিসাব দিতেছি।

ভাষা।	কতজন ব্যবহার করে।
হিন্দী	৯,৮১,১৫,০০০
বাংলা	৪,৯২,৯৪,০০০
তেলুগু	২,৩৬, ১,০০০
মরাঠী	১,৮১,৯৮,০০০
তামিল	১,৮৭,৮০,০০০
পঞ্জাবী	১,৬২,৩৪,০০০
রাজস্থানী	১,২৬,৮১,০০০
কন্নাড	১,০০,৭৪,০০০
ওড়িয়া	১,০১,৪৩,০০
গুজরাতী	৯৫, ৫২,০০০
ব্রহ্মদেশী	৮৪, ২৩,০০০
মলয়ালম্	৭৪, ৯৮,০০০
লাহ্ণ্ডা (পাশ্চাত্য পাঞ্জাবী)	৫৬, ৫২,০০০
সিন্ধী	৩৩, [illegible],০০০
অসমীয়া	৩৭, ২৭,০০০
কাশ্মীরী	[illegible]

বঙ্গভাষী লোকদের যে সংখ্যা উপরে দেওয়া হইল, তাহা ১৯২১ সালের সেন্সস্ রিপোর্ট অনুযায়ী। ইহা অপেক্ষা আরও কয়েক লক্ষ অধিক লোকের মাতৃভাষা বাস্তবিক বাংলা; কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তাহা হিন্দী কিম্বা অসমীয়া বলিয়া সেন্সস্ রিপোর্টে গৃহীত হইয়াছে।

যাহা হউক, বাংলাভাষীদের সংখ্যা এখন মোটামুটি পাঁচ কোটি ধরা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া আরও অনেকে বাংলা বলে, যাহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে। সাঁওতালেরা নিজেদের মধ্যে সাঁওতালীভাষা বলে; কিন্তু বাঙালীদের সঙ্গে বাংলা বলে। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থানে ওড়িয়ারা কাজ করে, তাহারা বাংলাও বলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত, ওড়িষ্যার সমস্ত শিক্ষিত ওড়িয়া বাংলা বলিতে পারেন, এবং বিহারের অনেক শিক্ষিত লোক বাংলা জানেন। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের কাশী প্রভৃতি স্থানের অনেক হিন্দুস্থানী বাংলা বলিতে পারেন। শিক্ষিত উৎকলীয় মাত্রেই বাংলা বহি পড়েন। ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বোধ হয়, শিক্ষিত অসমীয়ারাও বাংলা সাহিত্য পড়েন।

বাঙালী ছাড়া বাংলা জানে ও বলে খুব কম লোক)। তেমনি হিন্দুস্থানী ছাড়া হিন্দী জানে ও বলে খুব কম লোক। অন্যান্য ভারতীয় ভাষার পক্ষেও এই কথা সত্য। অন্য দিকে সমগ্র ইউরোপের লোকসংখ্যা ৪৭½ কোটি হইলেও প্রধান প্রধান কয়েকটি ইউরোপীয় ভাষাতেই পৃথিবীর ৪৫½ কোটি লোক কথা বলে। তা ছাড়া, নিজেদের, দ্বিতীয় ভাষারূপে ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করে এরূপ লোকের সংখ্যাও বিস্তর। ইউরোপীয় ভাষা সকলের প্রসার-বৃদ্ধি কিরূপে ঘটিয়াছে, তাহা বিবেচ্য। এবিষয়ে আমি আমার বক্তব্য ইংরেজীর দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

প্রধানতঃ উপনিবেশ স্থাপন ও দেশ জয় দ্বারা সাম্রাজ্য বৃদ্ধি হওয়ায় ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বাড়িয়াছে। উত্তর আমেরিকার কানাডা, আফ্রিকার দক্ষিণ আফ্রিকা, কেন্যা, রোডেশিয়া প্রভৃতি, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড ইত্যাদি ইংরেজের উপনিবেশ। ইংরাজীতে যদি কোন বহি ছাপিয়া প্রকাশিত করে, তাহা হইলে তাহা পৃথিবীর সকল মহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সকলে ক্রীত ও পঠিত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। তা ছাড়া আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে এবং ইউরোপের নানাদেশে ও জাপানেও উহার কাট্তি আছে। সকল সাম্রাজ্যের চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বহু বিস্তৃত বলিয়া এবং আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সেও ইংরেজী চলিত বলিয়া, ইংরেজী সাহিত্যের এইরূপ প্রসার।

শিল্পবাণিজ্যজীবী প্রধান প্রধান জাতিদের মধ্যে ইংরেজেরা অন্যতম। তাহাদের সঙ্গে কারবার চালাইতে হইলে ইংরেজী জানা দরকার। যে সব দেশ ইংরেজের উপনিবেশ নয় বা ছিল না, সেখানকার লোকেরাও ব্যবসার খাতিরে ইংরেজী শিখিয়া থাকে। সুতরাং শিল্পবাণিজ্যের বিস্তৃতি দ্বারাও ভাষা এবং সাহিত্যের প্রসার বাড়িয়া থাকে। গুজরাতি ভাষার সংখ্যা মোটে ৯৫ লক্ষ, পার্সী ও ভাটিয়া ধনী বণিক-শ্রেণী গুজরাতিভাষী বলিয়া গুজরাত অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ ভাষা। ইহাতে এমন কোন কোন রকমের বহি আছে, যাহা বাংলাতেও

নাই। ভারতবর্ষে এখন যত দেশী সংবাদপত্র আছে, তাহার মধ্যে গুজরাতী "বোম্বাই সমাচার" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা ১৮২২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইউরোপের নানাদেশ এবং জাপানে ও চীনে বিস্তর লোক ইংরেজী শিখে। রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র প্রথমতঃ ইংরেজীতে লিপিবদ্ধ হইয়া পরে রুশীয় ও জাপানী ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে ইতালি ও আল্‌বেনিয়ার মধ্যে সন্ধি ইতালীয় বা আল্‌বেনিয় ভাষায় লিখিত না হইয়া ইংরেজীতে লিখিত হইয়াছে।

কোন ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের আর একটি প্রধান কারণ, উহার উৎকর্ষ এবং তাহাতে নিবদ্ধ জ্ঞান সম্ভার। ইংরেজী কবিতাগ্রন্থ, নাটক, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতির উৎকর্ষ ও প্রাচুর্য্য বশতঃ, যাহারা ইংরেজ নয়, তাহারাও ইংরেজী সাহিত্য পড়িয়া থাকে। ইংরেজী লিখিবার ও ইংরেজী পড়িবার আর একটি কারণ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প ললিতকলা প্রভৃতি যে-কোন বিষয়ে মানুষই জ্ঞানলাভ করিতে চায়, তাহার কিছু কিছু বহি ইংরেজীতে আছে। অবশ্য, কোন কোন বিষয়ে ভাল ভাল বহি ইংরেজী অপেক্ষা জার্ম্মান্ ও ফরাসী ভাষাতেই বেশী আছে। কিন্তু আমরা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি বলিয়া ইংরাজী বহিরই উল্লেখ করিতেছি।

ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মভাব প্রবল হইলে তাহার দ্বারাও সাহিত্য পুষ্ট হয়, এবং ভাষার সম্পদ বাড়ে। বঙ্গে বৈষ্ণব ও শাক্তসম্প্রদায়ের চেষ্টায় ও প্রভাবে বঙ্গসাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। আধুনিক যুগে, খৃষ্টীয় মিশনারী কেরী ও মার্শম্যান্ প্রভৃতির চেষ্টায়, ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত লেখকগণের চেষ্টায় এবং রামকৃষ্ণ-মিশনের উদ্যোগে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। ইউরোপে ইংরেজীতে উইক্লিফ্ প্রভৃতি বাইবেলের অনুবাদ করায় ইংরেজী সাহিত্যের উপর তাহার প্রভাব তদবধি অনুভূত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে, জার্ম্মাণ ভাষায় লুথর কর্ত্তৃক বাইবেলের অনুবাদ জার্ম্মান্ গদ্যের একটি আদর্শ-স্থাপন করে।

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি, ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি প্রধানতঃ চারি রকমের হইয়া থাকে—দেশজয় ও উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার, শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তৃতি, সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন ও তাহাকে নানাবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিণত করা, এবং ধর্ম্মান্দোলন ও ধর্ম্মভাবের প্রবলতা। এইসব সূত্রে কেবল যে কোন একটি ভাষা শিখিবার ও উহার সাহিত্য পড়িবার লোক বাড়ে, তাহা নহে, উহাকে সমৃদ্ধ করিবার উপায় এবং লোকও বাড়ে। সাম্রাজ্য বহুবিস্তৃত হইলে লোকে সেখানে যাইয়া ও থাকিয়া নানাবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। তৎসমুদয় সম্বন্ধে বহি লিখিলে সাহিত্য পুষ্টতর হয়। বাণিজ্য উপলক্ষেও এই প্রকারে নানাদেশে গিয়া লোকে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে। এই অভিজ্ঞতাও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করে। নানাদেশের অভিজ্ঞতা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কল্পনার উত্তেজকও হইয়া থাকে। তাহার দ্বারা নানাবিধ কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়। কোন ভাষার কথক ও পাঠক বাড়িলে সেই ভাষায় লিখিত পুস্তকের প্রচার

হয়। তাহাতে লেখকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। লেখকের সংখ্যাও এই প্রকারে বাড়ে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, যে, দেশ জয় দ্বারা সাম্রাজ্য স্থাপন ও বৃদ্ধি যে একটি উপায়, গোড়াতেই তাহা বাদ দিয়া রাখিতে হয়। পরের দেশ জয় করিয়া তাহাকে অধীন করিয়া রাখা বড় রকমের ডাকাতি মাত্র। সুতরাং আমাদের পক্ষে যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলেও আমরা তাহার সমর্থন করিতাম না। কিন্তু এরূপ নৈতিক আলোচনাও এখন বাঙালীদের পক্ষে অনাবশ্যক। কেন না, আমরা পরাধীন; নিজেদের স্বাধীনতা লাভ করিবার শক্তিই আমরা অর্জন করিতে পারি নাই, পরকে আক্রমণ ত দূরের কথা। কিন্তু উপনিবেশ স্থাপন রূপ উপায়টা আমাদের সাধ্যায়ত্ত বটে।

উপনিবেশ স্থাপন হইতে পারে ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে ও বিদেশে। বিদেশের মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতীয়েরা পৌরজন-পদ-অধিকারবিহীন কুলি মজুররূপে কোথাও কোথাও থাকিতে পারে। ঐভাবে আমরা কোন ভারতীয়কে কোথাও যাইতে বলি না। তা ছাড়া, বাঙালীরা বাংলা দেশেরই সব কলকারখানার মিলের ও কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক জোগাইতে পারিতেছে না; প্রধানতঃ উড়িষ্যা, বিহার এবং আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের লোকেরাই এই কাজ করিতেছেন। সুতরাং শ্রমিকরূপে বিদেশে বাঙালী যাইবে না, ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলে বর্ণবিদ্বেষ নাই। সেখানে যে কেহ গিয়া যে কোন রকম পরিশ্রম—প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ ও ধন-সঞ্চয় করিতে পারে। বাংলা দেশে প্রতি বর্গমাইলে ৬০৮ জন লোক বাস করে। ব্রাজিলে প্রতি বর্গমাইলে ৯জন লোক বাস করে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, ব্রাজিলে কত লোক ধরিতে পারে। দেশটাও খুব বড়। ভারতবর্ষের আয়তন ১৮,০৫,৩৩২ বর্গমাইল, ব্রাজিলের ৩২,৮৫,৩১৮ বর্গমাইল। কিন্তু স্বাধীন জাতির লোক না হইলে এবং যে দেশে উপনিবেশ স্থাপিত হইবে তাহা সাহিত্য-হীন অসভ্য দেশ না হইলে, তথায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক নিজেদের ভাষা ও সাহিত্য প্রচলিত করিতে পারা যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বাহিরে কোথাও গিয়া বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তথায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চালাইবে, এরূপ সম্ভাবনা নাই।

ভারত-সাম্রাজ্যের মধ্যে বাঙালী কোথায় কোথায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারে, তাহা ভাবিলে দেখা যায়, যে, বাংলার সন্নিহিত নানা অঞ্চলে বাঙালী যাইতে পারে। বঙ্গের এবং সন্নিহিত কয়েকটি প্রদেশের আয়তন, লোক সংখ্যা এবং প্রতি বর্গমাইলের লোকসংখ্যা হইতে বুঝা যাইবে, যে, তথায় বাঙালীর স্থান হইতে পারে।

প্রদেশ।	আয়তন বর্গমাইল।	লোক সংখ্যা।	প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা।
আসাম	৫৩,০১৫,	৭৬,০৬,২৩০,	১৪৩

ছোট নাগপুর	২৭,০৬৫	৫৬,৫৩০২৮	২০৯,
ব্রহ্মদেশ	২৩৩,৭০৭	১৩২,১২,১৯২,	৫৭,
মণিপুর	৮৪৫৬	৩৮৪০১৬	৪৫,
বঙ্গ	৭৬,৮৪৩,	৪,৬৬,৯৫,৫৩৬	৬০৮,

বাংলা দেশের মধ্যে যত আদিম জাতীয় লোক বাস করে, তাহারা শিক্ষা পাইলে স্বভাবতঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চাই বেশী করিবে ; তাহাদিগের শিক্ষাকার্য্যে আমাদের খুব মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। হিন্দীভাষী যত শিক্ষিত লোক বাংলা দেশে বাস করে, তাহাদেরও বাংলা শিখিবার উপায় সহজ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, তাহাদের মাতৃভাষা বাংলা না হউক, তাহারা বাংলা সাহিত্যের পাঠক হইবে।

বাঙালীরা যদি শিল্পবাণিজ্যে অধিকতর মনোযোগী হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারাও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পুষ্ট হইবে। তাহা হইলে তাহা বিদেশীদের ও বাংলা শিখিবার একটি কারণ হইবে। এখন যে অল্পসংখ্যক বিদেশী বাংলা শিখে, তাহা বাংলা কাব্য আদির—প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর—উৎকর্ষ হেতু। আধুনিক হিন্দী সাহিত্য আধুনিক বঙ্গ সাহিত্যের মত উৎকৃষ্ট নহে। কিন্তু হিন্দী ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভূখণ্ডের অনেক ব্যবসাদার জাতির ভাষা বলিয়া ইউরোপে সেই কারণে উহার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মেনীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্জাবের পণ্ডিত তারাচাঁদ রায় উহা শিখাইয়া থাকেন।

বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন এবং উহাতে নিবদ্ধ জ্ঞানসম্ভার বৃদ্ধি আর এক উপায়। এবিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। সাহিত্য কথাটি সংকীর্ণতর অর্থে কবিতা, নাটক, উপন্যাস গল্প প্রবন্ধ প্রভৃতির প্রতি প্রযুক্ত হয় ; ব্যাপক অর্থে উহা ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থকর শিল্প, সুকুমার শিল্প, প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিষয়ক পুস্তকের প্রতি প্রযুজ্য। সংকীর্ণতর অর্থে যাহা সাহিত্য, তাহার উৎকর্ষ বঙ্গে অনেকটা সাধিত হইয়াছে ; ব্যাপক অর্থ তেমন হয় নাই। তাহা না হইলে বঙ্গসাহিত্য সকল দিক্ দিয়া সমৃদ্ধ হইবে না। হিন্দী, গুজরাটী, কন্নাড় প্রভৃতি অনেক ভারতীয় ভাষায় বাংলা বহির অনুবাদ হয়। তজ্জন্য অনেক অবাঙালী বাংলা শিখেন। বঙ্গসাহিত্য যত সমৃদ্ধ হইবে, তত বেশী অবাঙালী উহা শিখিবেন ও তত বেশী বাংলা বহির অনুবাদ হইবে।

হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নিজাম্ প্রতি বৎসর বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া উচ্চ শিক্ষালাভের উপযোগী নানা বিদ্যাবিষয়ক পুস্তক ইংরেজী হইতে উর্দ্দুতে অনুবাদ করাইতেছেন। কাশী-বিদ্যাপীঠের জন্য বাবু শিবপ্রসাদ গুপ্তের ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য হিন্দী বহি অনুবাদিত ও লিখিত হইতেছে। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ঐরূপ হিন্দী পুস্তক প্রকাশ করিবার নিমিত্ত বাবু ঘনশ্যাম দাস বিরলা পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বাংলার জন্য এরূপ কোন চেষ্টা হইতেছে না।

বাংলা দেশে পাঁচ ও তদধিক বয়সের হাজারকরা ১৮১ জন পুরুষ ও ২১ জন

স্ত্রীলোক লিখন পঠনক্ষম। সুতরাং ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চার আলোচনা প্রসঙ্গে কেবল লিখন পঠনক্ষম ৪২, ৫৪, ৬০১ জনকেই বঙ্গভাষী ধরা যাইতে পারে। শিক্ষা দ্বারা মোটামুটি প্রায় পাঁচকোটি লোককে লিখন পঠনক্ষম করিতে পারিলে তাহাতে বঙ্গ সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি নিশ্চয়ই হইবে। তখন পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা মোটামুটি এখনকার অন্ততঃ দশগুণ হইবে।

বঙ্গে লেখাপড়া চর্চ্চা কত কম, তাহা বঙ্গের ও অন্য কয়েকটি দেশের খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা হইতে অনুমিত হইতে পারে।

দেশ।	লোক সংখ্যা।	পত্রিকার সংখ্যা।	বৎসর।
বাংলা	৪৬,৬৯৫,৫৩৬	৬৭২	১৯২৪-২৫
জাপান	৫৯৭৩৬৮২২	৪৫৯২	১৯২৩
কানাডা	৯৫০৪৭০০	১৫৫৪	১৯২৪
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১১,৭১,৩৬,০০০	২০৬৮১	১৯২৪

আমরা যে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি, তাহা শুধু এই সংখ্যাগুলি হইতে বুঝা যায় না। আমাদের দেশের এক একখানা কাগজের গ্রাহক খুব বেশী হইলে কয়েক হাজার হয়। উপরি লিখিত দেশগুলিতে অনেক কাগজের প্রত্যেকটির গ্রাহক সংখ্যা কয়েক লক্ষ করিয়া।

বঙ্গে ১৯২৪-২৫ সালে ৩২৫৮ খানি বহি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে ৩০০১ খানি প্রথম মুদ্রিত, ২৪৭ খানি অনুবাদ বা পুনর্মুদ্রিত। সবগুলি বাংলা নহে, ইংরেজী, হিন্দী প্রভৃতিও আছে। ১৯২৩ সালে জাপানে ১০৯৪৮ খানি বহি মুদ্রিত হইয়াছিল।

রুশীয় সাধারণ তন্ত্রে ১৯২৫ সালে ২৬,৪১৬ খানি বহি প্রকাশিত হয়। ঐ বইগুলির মোট ২৪, ২০, ৩৫,৮০৪ খণ্ড ছাপা হয়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে ১৯২৪-২৫ সালে মোট ১৭০৩০ খানা প্রকাশিত হয়; তাহাদের মোট কত খণ্ড ছাপা হইয়াছিল জানিবার উপায় নাই। দেখা যাইতেছে যে যদিও ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা রুশিয়ার প্রায় দ্বিগুণ, তথাপি ভারতবর্ষে বহি প্রকাশিত হয় অনেক কম।

বাংলা বহির মধ্যে 'ভাষা' বিভাগে পরিগণিত বহি প্রায় সবই বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর পাঠ্য বহি, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতিও তাই, বিজ্ঞানের বহি নিতান্ত কম, ধর্ম্ম-বিষয়ক বহি অধিকাংশ স্থলে প্রাচীন বহির পুনর্মুদ্রণ, উপন্যাস ও গল্পের বহি অনেক। বাংলা বহি সাধারণতঃ এক এক সংস্করণে হাজার খণ্ড মাত্র ছাপা হয়; রুশিয়ায় যে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রদত্ত সংখ্যা হইতে জানা যায়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র দেখা যায়, যে, যেখানে সাহিত্যহীন ও সাহিত্যশালী লোকদের সংস্পর্শ ঘটে, সেখানে সাধারণতঃ সাহিত্যহীন জাতিরা প্রতিবেশী সাহিত্যশালী জাতিদের সাহিত্য গ্রহণ করে। যেমন বঙ্গে ও ছোট নাগপুরে সাঁওতাল ও অন্য কোন কোন সাহিত্যহীন জাতি সাহিত্যশালী জাতির সাহিত্য গ্রহণ করিতেছে। সাহিত্যহীন জাতিদের ভাষা লুপ্ত হইয়া গিয়া তাহাদের সাহিত্যশালী প্রতিবেশীদের ভাষাই

মাতৃভাষা হইয়া উঠিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্তও ভারতবর্ষে আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। রঙ্গপুরের অধিবাসী বাঙ্গালীরা আসামের কোন কোন সাহিত্যহীন জাতির প্রতিবেশী। তাহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমার এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, আপনারা যদি এই সব সাহিত্যহীন জাতিকে বাংলা শিখাইতে পারেন তাহা হইলে বাংলা সাহিত্যের পাঠক বাড়িবে—এমন কি কালক্রমে লেখকও বাড়িতে পারে। ইহা আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বার্থের দিক হইতেই বলিতেছি না। যাহাদের সাহিত্য নাই, তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট ও উন্নতিশীল সাহিত্যের সহিত পরিচিত করা, তাহাদের পক্ষে পরম কল্যাণকর। আপনাদিগকে এই হিতসাধন ব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছি :

নিরক্ষর লোক বহুল ভারতবর্ষেই যে এক একটি ভাষার বা সাহিত্যের বিস্তার এবং অন্য কোন ভাষা বা সাহিত্যের ক্ষয় হইতেছে, তাহা নহে ; ইউরোপেও ইহা ঘটিতেছে। স্কটল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত লউন। তাহার প্রাচীন ভাষা গেলিক। ১৯১১ সালে সেখানে কেবল ১৮৪০০০ জন লোক শুধু গেলিক বলিতে পারিত ; ১৯২১ সালে অর্থাৎ দশ বৎসর পরে ঐ সংখ্যা কমিয়া ৯৮২৯ হইয়াছিল।

সকল ভাষাতেই এমন অনেক গান প্রচলিত আছে বা ছিল যাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। অনেক উপকথাও এখনও অলিখিত অবস্থায় আছে। ইহা হইতে সাহিত্যের উপকরণ পাওয়া যায় এবং এক এক অঞ্চলের লোকের মনের অবস্থার ইতিহাস ও বিকাশ বুঝা যায়। এইজন্য এইগুলি সংগৃহীত ও মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক।

পরিশেষে বক্তব্য এই, যে, সাহিত্য মানুষের অন্তরের পূর্ণ বাহ্য প্রকাশ বলিয়া, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ে পূর্ণ আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতার উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ নির্ভর করে।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

দেবতত্ত্ব

ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ ব্রহ্মের প্রতীক মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া (অর্থাৎ ফটো রাখিয়া) সেবা করিতেছেন। বৌদ্ধগণ ভগবদবতার বুদ্ধের মূর্ত্তি পূজা করিতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী খ্রীষ্টের মূর্ত্তির উপাসনা করিতেছেন। জৈন জিনের মূর্ত্তি পূজা করিয়া পৌত্তলিক নহে। মোসলমানগণও পীর-পয়গম্বরের মূর্ত্তি সেবা করিয়া পৌত্তলিক হইল না। কেবল মাত্র আর্য্য হিন্দুগণ শিব-দুর্গা বিষ্ণু-লক্ষ্মীর মূর্ত্তি পূজা করিয়া পৌত্তলিক হইলেন, ইহা ভাবিয়া কূল পাইতেছি না। তাই আজ দেবতত্ত্ব জানিবার জন্য একটু আলোচনা করিব। দেবগণ সাকার কি নিরাকার ইহাই প্রবন্ধের বিশেষতঃ প্রতিপাদ্য হইবে। দেবতত্ত্ব অতি জটিল হইলেও আর্য্য মুনি ঋষিগণ দেবতত্ত্ব পরিজ্ঞানের পথ কিছু সরল করিয়া গিয়াছেন। আমিও তাঁহাদেরই পথ অনুসরণ করিব। কেবল যুক্তি তর্কের উপরে নির্ভর করিব না। সুতরাং খুব সহজ না হইলেও খুব কঠিন হইবে না। বেদে উপনিষদে, তন্ত্রে, পুরাণে সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ উপাসনার কথাই রহিয়াছে। ভগবদ্‌গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দেখিতে পাই,

এবং সতত যুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ?

সাকার ও নিরাকার উভয়বিধ উপাসনার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, ইহাই উদ্ধৃত শ্লোকটির দ্বারা অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিয়াছেন। উদ্ধৃত শ্লোকটির শঙ্করভাষ্য পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন। সাধারণের সুবিধার জন্য ভাষ্যের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

দ্বিতীয়প্রভৃতিষ্বধ্যায়েষু বিভূত্যন্তেষু পরমাত্মনো ব্রহ্মণোঽক্ষরস্য বিধ্বস্ত সর্ব্ববিশেষণ স্যোপাসনমুক্তম্‌। বিশ্বরূপাধ্যায়ে তু ঐশ্বরমাদ্যং সমস্ত জগদাত্মরূপং বিশ্বরূপং ত্বদীয়ং দর্শিত-মুপাসনার্থমেব ত্বয়া। তচ্চ দর্শয়িত্বোক্তবানসি মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদি। অতোঽহমনয়োরুভয়োঃ পক্ষয়োর্ব্বিশিষ্টতর বুভুৎসয়া ত্বাং পরিপৃচ্ছামীত্যর্জ্জুন উবাচ—এবমিতি।

পরশ্লোকেই উক্ত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতা স্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

উক্ত শ্লোকের অর্থের দিকে দৃষ্টি করিলে জানিতে পারা যায়—যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ স্বরূপের আরাধনা করেন, তিনিই যোগবিত্তম অর্থাৎ যোগিশ্রেষ্ঠ।

উক্ত শ্লোকের শঙ্করভাষ্য দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে—যে স্বরূপোপাসকাঃ সম্যগ্ দর্শিনো নিবৃত্তৈষণাস্তে তাবৎ তিষ্ঠন্তু। তান্ প্রতি যদ্ বক্তব্যং তদ্ উপরিষ্টাদ্ বক্ষ্যামঃ। যে ত্বিতরে-ময়ীতি। ময়ি বিশ্বরূপে।

এখন দেখা যাইতেছে, অদ্বৈতবাদী শঙ্করের ভাষ্যেও অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের প্রশ্নোত্তরে সাকার দেবতত্ব সন্নিবেশিত রহিয়াছে। একাদশ অধ্যায়ের মৎকর্ম্মকৃদিত্যাদি শেষ শ্লোকে মৎ (আমার) শব্দগুলি ভগবানের নিরাকার নির্গুণ স্বরূপের অথবা সাকার সগুণ স্বরূপের প্রতি লক্ষিত হইয়াছে অর্জ্জুনের এইরূপ সংশয় হইয়াছিল। উক্ত সংশয় দূর করিবার জন্যই ঐরূপ প্রশ্ন অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—সাকার বা সগুণ উপাসনাকারী ব্যক্তিগণই আমার মতে যোগবিত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। দেবতত্ব জানিতে হইলে শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত উপায় নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই যখন সর্ব্বজন সমাদৃত ভগবদ্গীতা গ্রন্থে সাকারোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ স্থানে বসাইয়াছেন, তখন আর্য্য হিন্দুগণ সাকারোপাসনা করিবার জন্য মূর্ত্তিপূজা করিয়া পৌত্তলিক আখ্যা পাইবার কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আর্য্য হিন্দুগণ কোনও দিনই পুতুলের পূজা করেন নাই আজও করেন না। তাঁহারা আত্মার উপাসনাই করিয়াছেন, আজও করিতেছেন পরেও করিবেন। আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্ সকল ঐশ্বর্য্যের আধার। আত্মা বা ঈশ্বর নিজের ঐশ্বর্য্যবশে সাকার হইয়া সাধকের সম্মুখীন হইবেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ কি? আত্মা বা ঈশ্বর কালী দুর্গা, শিব বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়া যুগে যুগে জগতের হিতসাধন করিয়াছেন, ইহা শাস্ত্রবাক্য ও সত্য। আর্য্যগণও আত্মার প্রতীক ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণের যাগযজ্ঞ করিয়া কালী দুর্গা, শিব, বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ কি?

নিরুক্তোত্তরষট্ক তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদে প্রথম খণ্ডে দেখিতে পাই,—তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তা অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানা বায়ুর্বেন্দ্রোবান্তরিক্ষস্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থান স্তাসাং মহাভাগ্যাৎ একস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তীত্যাদি। উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা বুঝিতে পারা যায় তিনটিই দেবতা। পৃথিবীবাসী অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষবাসী, সূর্য্য স্বর্গবাসী। মহাভাগ্যবশে একটিমাত্র দেবতা বহু নাম ও রূপে পরিচিত হইয়াছেন। সর্ব্বানুক্রমণী নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই—এক এব মহানাত্মা মূলভূতা দেবতা, তস্যা অগ্নি বায়ু সূর্য্যরূপা তিস্র এবাঙ্গভূতা দেবতাঃ ক্রমেণ পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুস্থানাস্তাসাংতিসৃণামিতরাঃ সর্ব্বা দেবতা বিভূতয়ঃ। ইত্যাদি ঋগ্বেদ ১।১৬৪.৪৬ মন্ত্রে দেখিতে পাই—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ?

একই সদ্বস্তু ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি নামে পরিচিত। শোভন পক্ষবিশিষ্ট গরুত্মান্ নামেও তাঁহাকে পণ্ডিতেরা ডাকিয়া থাকেন। ইনি এক হইলেও বহু বলিয়া অভিহিত হন। ইঁহাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলে। সুতরাং ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি অভিন্ন।

নিরুক্ত ও সর্ব্বানুক্রমণীর বাক্যাবলি দ্বারা বুঝিতেছি—আত্মাই একমাত্র দেবতা। অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু এই তিনটি আত্মার অঙ্গভূত দেবতা। অন্যান্য দেবতাগণ আত্মার বিভূতি মাত্র। ঋগ্বেদে দেখিতে পাই,—পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যম্। যাহা কিছু হইতেছে, যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইবে; সমস্তই সেই পুরুষেই; অর্থাৎ স্বীয় ব্যাপকতা নিবন্ধন পুরুষ সকলেরই আধার। বৈদিক ব্রাহ্মণভাগে দেখিতে পাই—'অথাতো বিভূতয়োঽস্য পুরুষস্য'। সুতরাং আত্মাই যে একমাত্র দেবতা ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু অন্যান্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ দেবতাও যে আত্মার বিভূতিস্বরূপ তাহাও স্বীকার করিতে হইবে, ইহা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। আর্য্য হিন্দুগণ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আত্মার পূজাই করিয়া থাকেন, পুতুলের পূজা করেন না। মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা আত্মোপাসনারই প্রকার ভেদ মাত্র। কোনও বস্তুরই আকার ব্যতীত চিন্তা করা যায় না। সেইজন্য বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে প্রত্যেক দেবতারই স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। সাকারোপাসনা দ্বারা সাধক যখন তন্ময় হইয়া যায়, তখন আর ভেদ বুদ্ধি থাকিতে পারে না। উপাস্য ও উপাসক এক হইয়া যায়; আত্মার অনন্তভাব দূর হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণও বিষয় গ্রহণ করে না। জীব তখন আত্মস্থ হইয়া স্বরূপ ভুলিয়া যায়। আত্মার কোনও স্বরূপ দেখিতে পায় না। সাধক তখনই মনে করে, আত্মার কোনও স্বরূপ বা মূর্ত্তি নাই। আত্মা এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার, নির্ব্বিকার; আনন্দই তাহার স্বরূপ, আত্মার অন্য কোনও রূপ নাই। বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপ স্বীকার না করিলে উপাসনাই সম্ভব হইবে না, বা হয় না। আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনই আত্মার প্রকৃত উপাসনা। স্বরূপ না থাকিলে শ্রবণ করিব কি? মননই বা কাহার হইবে? নিদিধ্যাসনই বা করিব কাহাকে?

নিরাকারবাদী সত্য, জ্ঞান ও আনন্দকেই ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ বলিয়া থাকেন। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দের শ্রবণ সম্ভব নহে, মননও হয় না, নিদিধ্যাসনই বা কিরূপে হইবে, তাহা নিরাকারবাদীই বলিতে পারেন। এ পর্য্যন্ত কোনও নিরাকারবাদীই উহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। বলিলেও বুঝিবার সুযোগ পাই নাই। তিন খানি বেদও যে আত্মা, ঈশ্বর বা দেবতার আকার নির্ণয় করিয়াছে, তাহাই এখন আলোচনা করিয়া দেখাইব। যজুর্ব্বেদের ২৭ অধ্যায়ের ৩০ মন্ত্রে দেখিতে পাই—ইন্দ্রের বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন—'স ত্বং নশ্চিত্র বজ্রহস্ত'; শিব বা রুদ্রের স্তুতিতে ১৬ অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে দেখিতে পাই—'যা তে রুদ্র শিবা তনূঃ'। এই অধ্যায়ের ২৮ মন্ত্রে দেখিতে পাই—নীলগ্রীবায়, শিতিকণ্ঠায়। ইহার পরের মন্ত্রেই রহিয়াছে—কপর্দ্দিনে, ইষুমতে। এই অধ্যায়ের ৪১ মন্ত্রে শঙ্কর, শিব প্রভৃতি শব্দও রহিয়াছে। তাহা হইলে যজুর্ব্বেদও দেবতার শরীর বা আকারের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, ইহা অস্বীকার করা যাইবে না। যজুর্ব্বেদের ব্যাখ্যাকার মহীধর, উবট প্রভৃতি কপর্দ্দী প্রভৃতি শব্দের জটাজুট ধারিণে, শ্বেতকণ্ঠায়, কৃষ্ণগ্রীবায় বাণযুক্তায় অর্থ করিয়াছেন। "যাতে রুদ্র শিবা তনূ" ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—হে রুদ্র তে যা শিবা শান্তা তনূঃ

শরীরম্। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে শিব বা রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণেরও শরীর ছিল অন্যান্য দেবগণও যে শরীরী তাহাও সংক্ষেপে বেদ হইতেই দেখাইবার চেষ্টা করিব। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিস্তারভাবে দেখান সম্ভব নহে। বিস্তারভাবে জানিতে হইলে মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন যজুর্ব্বেদের একশত শাখা, সামবেদের সহস্র, ঋগ্‌বেদের একবিংশতি এবং অথর্ব্ববেদের নয় শাখা। একশত মধ্বর্য্যুশাখাঃ সহস্রবর্ম্মা সামবেদঃ একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যঃ। বর্ত্তমানে বেদের অধিকাংশই পাওয়া যায় না। কাজেই সকল দেবতার নাম বা মূর্ত্তির কথা সংগৃহীত বেদে নাই, থাকাও সম্ভব নহে। যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, যাহা আছে, তাহাই প্রকাশ করিলাম। ভবিষ্যতে সমগ্র বেদ পাওয়া গেলে দেখিতে পাইবেন—বেদে প্রচলিত সকল দেবতারই নাম ও মূর্ত্তির বিশদভাবে পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ মুনি ঋষিগণ প্রতারক বা স্বার্থান্ধ ছিলেন না। আমাদের পিতৃপিতা-মহগণও মূর্খ ছিলেন না। তাঁহারা আমাদিগকে যে পথে পরিচালিত করিয়া গিয়াছেন, উহাই সত্যপথ; ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ঋগ্‌বেদের রাত্রিসূক্ত পাঠ করিলে—শ্রীসূক্ত দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন—দুর্গা-লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ বেদেই রহিয়াছে। তান্ত্রিক কালী প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যাও ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের বিভূতি, উঁহারাও শরীরী। আত্মা বা ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিবলে সাধকের অভীষ্ট বা রুচিকর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যুগে যুগে জীবের মঙ্গল করিয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ তন্ত্র শাস্ত্রকেই সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ক্রমশঃ দেখাইতেছি। ভগবান্ বা আত্মা যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন, আর্য্যগণ সেই সেই আকারের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মূর্ত্তিতে আত্মচৈতন্যের আরোপ করিয়া আত্মা বা ঈশ্বরের আরাধনা করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল হইতে রাত্রিসূক্তের একটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি দুর্গাদেবীর বর্ণনায় কি বলিয়াছে।

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে" উদ্ধৃতমন্ত্রে দেখা যাইতেছে দুর্গাকে অগ্নিবর্ণা বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের আরও একটি সূক্ত দেখাইতেছি—পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব কৃষ্ণবর্ণ নমোঽস্তু তে। উদ্ধৃত মন্ত্রে দেখিতেছি—দেবতাকে নমস্কার করিতে যাইয়া ঋগ্‌বেদই বলিতেছেন—হে পিঙ্গলবর্ণ চক্ষুযুক্ত রক্তবর্ণগ্রীবাসম্পন্ন কৃষ্ণবর্ণ তোমাকে নমস্কার করি। ইহাদ্বারা স্পষ্টই দেবতারা যে শরীরী তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ঐ দশম মণ্ডলের দেবীসূক্তে দেখিতে পাই—অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ" অর্থাৎ আমি বেদবিরোধীদিগকে মারিবার জন্য রুদ্রকে ধনু দান করিয়াছি। এখন দেখিব সামবেদকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করিতে পারি কি না? সামবেদের ঐন্দ্রপর্ব্বের দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১০ম মণ্ডলের ৮ম মন্ত্রে দেখিতে পাই—অপাং ফেনেন নমুচেঃ শিরঃ ইন্দ্রোদবর্ত্তয়ঃ। ঐ ঐন্দ্রপর্ব্বে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৭ম খণ্ডে ৫ম মন্ত্রে দেখিতে পাই—ইন্দ্রো দধীচো অস্থিভিঃ বৃত্রস্য প্রতিকৃতঃ। উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অর্থের

দিকে মনোনিবেশ করিলে বুঝিতে পারি ইন্দ্রনামক দেবতা জলের ফেন দ্বারা নমুচি নামক কোনও ব্যক্তির বা অসুরের মস্তক চূর্ণ করিয়াছিলেন; ও ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা অসুর দিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আরও দেখিতে পাই—ঐ সামবেদের উত্তরার্চ্চিক নবমাধ্যায়ের প্রথম মন্ত্রে ইন্দ্রকে পুর (গৃহাণি) ভেদকারী যুবা কবি (পণ্ডিত) অমিত বলশালী বজ্রধারী বলিয়াছেন। মন্ত্রটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—

'পুরং ভিন্দু র্যুবা কবি-রমিতৌজা অজায়ত।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য কর্ম্মণো ধর্ত্তা বজ্রী পুরষ্টুতঃ॥"

সামবেদের উত্তরার্চ্চিক চতুর্থ খণ্ডে সোমকেও 'পিশঙ্গং' 'সুহস্ত্যা" প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত করিয়াছেন। সামবেদ ব্যাখ্যাকার সায়ণও ঐ ঐ পদের ব্যাখ্যায় সোমকে হিরণ্যদ্বারা পিশঙ্গ ও শোভনাঙ্গুলিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা হইলে ইন্দ্র, সোম প্রভৃতি দেবতাগণকে শরীরী স্বীকার না করিয়া উপায় কি? ঋগ্বেদ ৫ম মণ্ডলে শ্রীসূক্তে লক্ষ্মীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

হিরণ্যবর্ণ্যাং হরিণীং সুবর্ণ রজতস্রজাং।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো ম আবহ॥

আমরাও সুবর্ণবর্ণা লক্ষ্মীরই পূজা করিয়া থাকি। লক্ষ্মীও বৈদিক দেবতা। তাহা হইলে পরমব্রহ্মের প্রতীক শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, লক্ষ্মীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিলে পৌত্তলিক বলিয়া হাস্যাস্পদ হইবার কারণ কি?

বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণের প্রথমেই দেখিতে পাই—দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপম্। মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চেত্যাদি। ৪।৩।১। ছান্দোগ্যের প্রথম প্রপাঠকের ষষ্ঠ খণ্ডে দেখিতে পাই—"য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।" মুণ্ডকোপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকে দেখিতে পাই—যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষমিত্যাদি। দ্বিতীয় মুণ্ডকে দেখিতে পাই—হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ তচ্ছুভ্র মিত্যাদি। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ৩১ অধ্যায়ের ১৮ মন্ত্রে দেখা যায়—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

ঐ ঐ মন্ত্র ও উপনিষৎ বাক্যগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বুঝি, আত্মা বা ঈশ্বরের আকার আছে। পরমাত্মা পরমেশ্বর পৃথিবীর মঙ্গল কামনায় দৈত্য-দানব দমন করিবার জন্য যখন যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্ট পূরণ করিয়াছেন, সাধক সেই সেই মূর্ত্তির আজীবন পূজা করিয়াছেন। ঐ ঐ মূর্ত্তির পূজা করিবার উপদেশও প্রদান করিয়াছেন। আমরা সাধক পুরুষের উপদেশে শিব-দুর্গা, বিষ্ণু-লক্ষ্মীর পূজা করিয়া আসিতেছি। দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করা কল্পিত নহে। পূর্ব্ব উদ্ধৃত বেদ ও উপনিষৎ স্পষ্টাক্ষরেই দেবমূর্ত্তির কথা বর্ণে বর্ণে বলিয়াছেন।

কেনোপনিষদের চতুর্দ্দশ কারিকা হইতে ২৮ কারিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিলেও দেববিগ্রহের

স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। সাধারণের অবগতির জন্য কেনোপনিষদের গল্পটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম; ব্রহ্ম কোনও এক সময়ে দেবগণের হিতের জন্য বৈদিক নিয়মাতিক্রমকারী অসুরদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন। সুরগণ ব্রহ্মকৃত জয়কে নিজের জয় বিবেচনা করিয়া গৌরবোন্মত্ত হইয়াছিলেন। দেবগণের ঐরূপ মিথ্যা জ্ঞান ব্রহ্ম বুঝিতে পারিয়া সুরবৃন্দের সমীপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সুরগণ ব্রহ্মের প্রাদুর্ভূত মূর্ত্তিটি চিনিতে না পারিয়া প্রথমে অগ্নিকে, দ্বিতীয় বার বায়ুকে, তৃতীয়ে ইন্দ্রকে প্রাদুর্ভূত ব্রহ্মমূর্ত্তির পরিচয় পাইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র কেহই ব্রহ্মমূর্ত্তির পরিচয়লইতে সমর্থ হইলেন না। অগ্নি ও বায়ু হীনপ্রভ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইন্দ্রও যখন ঐরূপ ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন আকাশে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্না হৈমবতী উমাকে প্রাদুর্ভূতা দেখিয়া যক্ষের অর্থাৎ ব্রহ্মের বিবরণ জ্ঞাপনে উমাকে সমর্থা মনে করিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—ঐ যক্ষ কে? ইন্দ্রের প্রশ্নে উমা বলিলেন—ইনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের বিজয়ে তোমরা জয়যুক্ত হও। উক্তরূপে প্রথমে ইন্দ্রদেব ব্রহ্মকে হৈমবতীর সাহায্যে জানিয়াছিলেন। পরে অগ্নি ও বায়ু ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। প্রথমে ইন্দ্র ব্রহ্ম পদার্থ জানিয়াছিলেন বলিয়া, ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। উদ্ধৃত আখ্যায়িকা দ্বারা জানিতে পারা যায়—ব্রহ্ম শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। হৈমবতী উমাও শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রাদিও শরীর গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেদান্ত দর্শনে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ২৭ সূত্রের শারীরক ভাষ্যেও দেবগণের বিগ্রহের কথা শঙ্কর স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিম্নে সূত্র ও ভাষ্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেক প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ।" যদি বিগ্রহবত্ত্বাদ্যভ্যুপগমেন দেবাদীনাং বিগ্রহবত্ত্বাদিকারো বর্ণ্যেত... ...তদা বিরোধঃ কর্ম্মণিস্যাৎ... ...নায়মস্তি বিরোধঃ, কস্মাৎ অনেক প্রতিপত্তেঃ। একস্যাপি দেবতাত্মনো যুগপদনেক স্বরূপ প্রতিপত্তিঃ সম্ভবতি। কথমেতদবগম্যতে দর্শনাৎ। উদ্ধৃত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যকার শঙ্কর তদীয় ভাষ্যে উক্ত সূত্রের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উদ্ধৃত ভাষ্যের অর্থালোচনা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়—শঙ্কর প্রথমে আপত্তি বা বিরোধ দেখাইয়া বলিয়াছেন—যদি দেবতাদিগের শরীর স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানাধিকার বর্ণনা কর, তাহা হইলে যাগাদি কার্য্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এক ইন্দ্র কিরূপে এক সময়ে বহুযজ্ঞে উপস্থিত থাকিয়া আহুতি গ্রহণ করিবেন? উত্তরে বলিতেছেন,—ঐরূপ আপত্তি সম্ভব নহে। যজ্ঞের দেবতা ইন্দ্রাদির শরীর স্বীকার করিলে তাঁহাদের যজ্ঞকর্ম্মে উপস্থিতি অসম্ভব নহে। ইন্দ্র এক হইলেও মহিমা বা বিভূতি বলে বহু শরীর পরিগ্রহ করিতে পারেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদী হইয়াও দেবতাদিগের শরীর স্বীকার করিয়াছেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই—শাকল্যের প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—কতি দেবা ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতাত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রেত্যোমিতি হোবাচে-

ত্যাদি। উদ্ধৃত আরণ্যকের অর্থে বুঝিতে পারি—যাজ্ঞবল্ক্য দেবতাসংখ্যা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—দেবতার সংখ্যা ১।২।৩।৬।৩৩।৩৩০০।৩৩০০০। পরেই বলিয়াছেন—একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া ৩৩টিই মূল যজ্ঞদেবতা। এই ৩৩টি দেবতার বিভূতিই ৩৩০০ ও ৩৩০০০। মহাভারত আদি পর্ব্বের ৪১ শ্লোকের টীকায় ৩৩,০০,০০,০০০ দেব বিগ্রহের সন্ধানও পাওয়া যায়। পুরাণের কথা আজকাল পুরাণ হইয়া গিয়াছে, কাজেই তুলিলাম না। উদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের ব্রাহ্মণভাগ আচার্য্য শঙ্করও দেবতাধিকরণে ১।৩।২৭ সূত্রের শারীরক ভাষ্যে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আচার্য্য শঙ্কর অদ্বৈতবাদের ভাষ্য রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" সর্ব্বত্রই ব্রহ্মচৈতন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতিতেও ব্রহ্মচৈতন্যের অভাব নাই। তবে আর শিব-দুর্গা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি প্রতিমায় চৈতন্য থাকিতে বাধা কি? আর্য্য হিন্দুগণও ব্যাপক চৈতন্যকে ব্যাপ্য ভাবে, অসীমকে সীমাবদ্ধ করিয়া, অপরিমিতকে পরিমিতাকারে পরিণত করিয়া পূজা করিতেন। পরস্পরের সমভাব না থাকিলে ভাবের আদান প্রদান সম্ভব হয় না, ইহা সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। জীব পরিচ্ছিন্ন, পরিমিত বা সসীম। অপরিসীম আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিতে না পারিলে, ভাবের আদান প্রদান অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাই আর্য্যগণ আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিবার জন্য প্রতিমা প্রস্তুত করিতেন, নির্ম্মিত প্রতিমাতে আত্মার ধ্যানাবাহন করিতেন। আত্মপ্রতীক প্রতিমা গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। অনুভূতানন্দে বিভোর হইয়া বলিতেন—"সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"। আত্মা বা ঈশ্বর তখন আনন্দাভিভূত জীবের অভিলাষ পূরণ করিতেন, সাধকের অভীষ্ট রূপ ধারণ করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমানের পক্ষে শরীর ধারণ করা কঠিনও নহে, আশ্চর্য্যরও নহে। তবে আর মূর্ত্তিস্বীকারে বিপ্রতিপত্তি কি থাকিতে পারে? তবে যদি কেহ বলিতে চাহেন যে, আমাদের আত্মা বা ঈশ্বর সর্ব্বত্র সমভাবে আছে ও থাকিবে, আমাদের আত্মা গাছে গাছে নাচিবে, ডালে পাতায় থাকিবে। আমরা আত্মার অস্তিত্ব সর্ব্বত্র দেখিতে পাই; কিন্তু তোমাদের প্রতিমাতে আত্মা বা ঈশ্বরের স্থান নাই। তাঁহাদের নিকট আমাদের নিরুত্তর থাকাই সমীচীন মনে করি। আজকাল প্রতীচ্যের প্রভাবে প্রাচ্য বিস্মিত হইয়া পড়িতেছে। সকলের মুখেই প্রতীচ্যের জয়গান শুনিতে পাই। প্রতীচ্যের জড় বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা ও প্রাচ্যের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের নিন্দাবাদে কর্ণযুগল জর্জ্জরিত হইতেছে। ইহা দ্বারা আমাদেরই অজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে। একদিন প্রাচ্যও জড়বিজ্ঞান প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। যখন প্রতীচ্যের নাম গন্ধও প্রাচ্যে আসিয়া পৌঁছায় নাই, তখনও মেঘনাদ মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। মহাভারতে জলে লুকায়িত জাহাজের কথা আছে।

ততঃ সাগরমাসাদ্য কুক্ষৌ তস্য মহোর্ম্মিণঃ।

সমুদ্রনাভ্যাং শাল্বোঽভূৎ সৌভমাস্থায় শত্রুহন্। বনপর্ব্ব, ২০।১৭

হে শক্রহন্! শাল্ব রাজা মহাতরঙ্গযুক্ত সাগরে গমন করিয়া তাহার গর্ভের মধ্যে সৌভ যানে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়াছিল। আকাশে চালিত যানের কথাও মহাভারতে আছে।

ন তত্র বিষয়স্থাসীন্মম সৈন্যস্য ভারত।
খে বিষক্তং হি তৎ সৌভং ক্রোশমাত্র ইবাভবৎ। বন, ২০।২৬

হে ভারত! শাল্বের সেই সৌভপুর আকাশে ক্রোশ পরিমিত দূরে থাকাতে ঐ সৌভনগর আমার সৈনিক পুরুষদিগের অবিষয় হইয়াছিল। এদেশে (অর্থাৎ প্রাচ্যে) অর্ণবপোত, বাষ্পীয় যান নির্ম্মিত হইয়াছিল। দূর হইতে দূরান্তরের সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। যুদ্ধের জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ও বিষাক্ত বাষ্পের ব্যবহার প্রণালীও প্রাচীনেরা জ্ঞাত ছিলেন। বিস্মিত হইবার কোনও কারণ নাই। আর্য্যগণ উত্যক্ত হইয়া ভারতের কল্যাণ কামনায় ঐ সকল জড়বিজ্ঞানবাদ ছাড়িয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উত্যক্ত হইবার কারণ বিপুল অর্থসংগ্রহের কদর্য্য চেষ্টা হইতে বিরত থাকা। জড়বিজ্ঞানবাদ চালাইতে হইলে প্রচুর অর্থ চাই, কায়িক পরিশ্রম চাই। ঐরূপ অর্থোপার্জ্জনের কদর্য্য চেষ্টা ও শরীর ক্লেশকারী পরিশ্রমের ফল প্রতীচ্যের দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন। আজ একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর অল্পমাত্র বিভূতি দ্বারা ঐরূপ কল-কারখানা করিয়া এরোপ্লেন উড়াইয়াও প্রতীচ্য অস্থির হইয়াছে। অস্থির হইবার কারণ আর কিছুই নহে, সংযমের অভাব ও অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের প্রতি অত্যাচার। বর্ত্তমান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সঙ্ঘর্ষে দেখিতে পাইতেছেন—যুদ্ধ করিতে অস্ত্র লাগিবে না। কল-কারখানা না হইলেও চলিতে পারে। উড়ো কল না উড়িলেও সমুদ্র তীরে যাইয়া লবণ সংগ্রহ করা যায়। চাই সংযম, চাই আত্মপ্রতিষ্ঠা। অধ্যাত্ম জ্ঞান ব্যতীত আত্ম-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতে পারে না। অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের জন্যই উপাসনা প্রয়োজন। আত্মপ্রতীক দেবমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। আত্মার প্রতীক দেববিগ্রহ ব্যতীত উপাসনা সম্ভব হয় বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিনা। সিদ্ধব্যক্তির পক্ষে নিরাকার উপাসনা সম্ভবপর হইলেও উপাসনার প্রারম্ভে প্রতিমা সর্ব্বথা প্রয়োজন হইবে, ইহা আমরা বর্ণে বর্ণে অনুভব করিয়াছি। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—মীমাংসা দর্শনকার দেবতার মূর্ত্তি স্বীকার করেন নাই, মন্ত্রকেই দেবতা বলিয়াছেন। আমি বলি তাহা নহে, মীমাংসা দর্শনেও দেবতার শরীর স্বীকৃত হইয়াছে। মীমাংসা দর্শনে দেবগণকে আত্মপ্রতীক বলিয়াছে; মন্ত্রগুলিকে দেবপ্রতীক বলা হইয়াছে। যে মন্ত্রদ্বারা যে দেবতার আহুতি দান বা উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, ঐ মন্ত্রে সেই দেবতার আকারের বিবরণ আছে বলিয়াই মন্ত্রাত্মক দেবতা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। একটু প্রণিধান পূর্ব্বক পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মন্ত্রগুলিই যে দেবতার শরীর, ইহা বুঝাইতে হইলে আর একটি প্রবন্ধের প্রয়োজন হইবে। বারান্তরে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আজকাল দেবতাগণের বাসস্থান, আহার্য্য ও কার্য্য

লইয়া একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। আমরা যোগসূত্রের বিভূতিপাদের ২৬ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যের অংশবিশেষ তুলিয়া দেখাইতেছি, "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" এই সূত্রের ব্যাসভাষ্যে দেখিতে পাই—

অবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবৎ ভূর্লোকঃ। মেরুপৃষ্ঠাদারভ্য আধ্রুবাৎ গ্রহ-নক্ষত্র-তারা বিচিত্রোঽন্তরিক্ষ লোকঃ। তৎপর স্বর্লোকঃ। চতুর্থঃ মহর্লোকঃ। ত্রিবিধোঃ ব্রাহ্মঃ, তদ্‌যথা—জনলোক স্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি।

ভূলোকে—দেবজাতীয়, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিম্পুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মারক, অপ্সরঃ, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড, বিনায়কগণ বাস করে।

ভুবর্লোকে—গ্রহ ও নক্ষত্রগণ।

স্বর্লোকে—সর্ব্বে সঙ্কল্পসিদ্ধা অনিমাদ্যৈশ্বর্য্যোপপন্নাঃ কল্পায়ুষো বৃন্দারকা কামভোগিন ঔপপাদিক দেহাঃ।

মহর্লোকে—মহাভূত বশিনো ধ্যানাহারাঃ কল্প সহস্রায়ুষঃ।

জনলোকে—ভূতেন্দ্রিয় বশিনঃ।

তপোলোকে—ভূতেন্দ্রিয়ঃ প্রকৃতি বশিনঃ সর্ব্বে ধ্যানাহারা ঊর্দ্ধরেতসঃ ঊর্দ্ধমপ্রতিহত-জ্ঞানা অধরভূমিষ্বনাবৃতজ্ঞান বিষয়াঃ।

সত্যলোকে—অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠাঃ উপর্য্যুপরিস্থিতা প্রধানবশিনো যাবৎ সর্গায়ুষঃ।

ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ, সত্যস্বরূপ ৭টি লোক অর্থাৎ বাসস্থান আছে। পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি অগ্নি পৃথিবীবাসী, বায়ু বা ইন্দ্র অন্তরিক্ষবাসী, সূর্য্য স্বর্গবাসী। পৃথিবীই ভূলোক, ভুবর্লোকই অন্তরিক্ষ, স্বর্লোকই স্বর্গরাজ্য। এই স্বর্গরাজ্যেই ইন্দ্র রাজত্ব করিতেন। প্রত্যুত তিনি ভুব বা অন্তরিক্ষবাসী দেবতা ছিলেন। ইন্দ্র যে কোনও এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি নহেন, কর্ম্মদ্বারা ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে হইত, এ বিষয়ে বহু কথাই বলিবার আছে। সম্প্রতি ঐ বিষয় হইতে বিরত থাকিতে হইল। স্বর্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত দেবগণের বাসস্থান বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। ঐ সকল দেবগণের বাসস্থানে স্বোপার্জ্জিত শুভ-কর্ম্ম ফলদ্বারা মনুষ্যাদি জীবগণও যাইতে পারিত। ইহার সন্ধানও শাস্ত্রে আছে। যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মানবাদি জীবগণও স্বর্গাদি রাজ্য ভোগ করিতে পারিতেন। ঐ সকল কর্ম্মের উপদেশ মীমাংসা দর্শনে বিশেষরূপে বিবৃত রহিয়াছে। যোগ দর্শনেও আছে—স্বর্লোকাদি পবিত্র স্থানে যেরূপ দেবগণ বাস করিতেন সেইরূপ ভূলোক বা পৃথিবী বাসীরাও বাস করিতে পারিতেন। স্বর্গাদি লোকবাসী দেবগণ আহারের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। তাঁহাদের ইচ্ছানুরূপ সঙ্কল্পমাত্রেই ভোগ্য বস্তু উপস্থিত হইতে। ইঁহারা ইন্দ্রিয়বশবর্ত্তী ছিলেন না। ইন্দ্রিয়গণই ইঁহাদের বশত্বপ্রাপ্ত হইত। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব বিভূতিবলে সর্ব্ববিধ অলৌকিক কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইতেন। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াও বাস করিতেন না।

পিতা মাতার সংযোগ ব্যতীতই দেবগণ দিব্য শরীর ধারণ করিতে পারিতেন। ধ্যানাহারাঃ, উপপাদিকদেহাঃ, সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ প্রভৃতি শব্দগুলির ব্যাখ্যার দিকে লক্ষ্য করিলেই উপরি উক্ত বিষয়গুলি বুঝিতে পারা যায়। ব্যাখ্যাকার বাচস্পতি মিশ্র "ধ্যানাহারাঃ ধ্যানমাত্রতৃপ্তাঃ, ঔপপাদিকদেহাঃ পিত্রোঃ সংযোগমন্তরেণা-কস্মাদেব দিব্য শরীরমেষাং ভবতীতি। সঙ্কল্পসিদ্ধাঃ সঙ্কল্পমাত্রাদেবৈষাং বিষয়া উপনমন্তি" অর্থ করিয়াছেন। উদ্ধৃত ব্যাসভাষ্যদ্বারা দেবগণের বাসস্থান একরূপ পাওয়া গেল। আহার্য্যও ভূলোকবাসীরাই যোগাইত। দেবগণের ভূলোক রক্ষাই একমাত্র কার্য্য ছিল। দেবগণ নিজ নিজ বিভূতিদ্বারা ভূলোকে আসিয়া প্রত্যক্ষেই হউক বা পরোক্ষেই হউক আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। দেবগণ সর্ব্বথা যোগী ছিলেন। যোগসিদ্ধ পুরুষগণ বাষ্পাহারী, বায়ু হইতেই আহার্য্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। দেবগণও ভক্তপ্রদত্ত খাদ্য হইতে অগ্নি ও বায়ুদ্বারা শোষিত বাষ্পই প্রায়শঃ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাজেই আমরা দেবপ্রদত্ত দ্রব্যের অপচয় দেখিতে পাই না। ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়ারও কারণ আর কিছুই নহে। অগ্নিতে দ্রব্য নিক্ষেপ করিলে দ্রব্যের পার্থিব ভাগ ভস্ম হইয়া পড়িয়া থাকিবে, জলীয়ভাগ বাষ্পাকারে পরিণত ও বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া দেবগণের নিকটে উপস্থিত করিবে। ইহাই দার্শনিক যুক্তি। প্রত্যেক বস্তুতেই যে পঞ্চভূতের সমবায় রহিয়াছে উহা আমি অনেকবার আমার লিখিত "প্রাচ্যদর্শন" নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছি। এখানে আর বলিব না। দেবগণের বাসস্থান লইয়া অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা ঐ সকল মত সমর্থন করিতে না পারিয়া দুঃখিত। ব্রহ্মলোক—সাইবেরিয়া, অন্তরিক্ষলোক—আফগানিস্থান প্রভৃতি বলিয়া তাঁহারা সুখী হইলেই ভাল। পরন্তু তাঁহারাও দেবতার শরীর স্বীকার করিয়া আমাকে সমর্থন করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের দেবতা অনিত্য বিগ্রহবতী; আমার মতে দেবগণ নিত্য বিগ্রহবান্। তাঁহারা বলিতেছেন—ছিল; আমি বলিতেছি—এখনও আছেন।

ভারতীয় শাস্ত্র-পদ্ধতিতে কোনও কিছুরই অভাব ছিল না, নাইও। একমাত্র ম্লেচ্ছভাব আসিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ভারতে সে সংযম নাই, সে আত্মবোধও নাই। অধ্যাত্মবোধ ও বিদ্যার নিন্দাই শুনিতে নাই। ব্যবহার দেখিতে পাই না। দেবতা সাকার কি নিরাকার, ইহা শুনিবেই বা কে? যাহা হউক, দুই চারিটি বন্ধুলোকের অনুরোধে আমি সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিলাম। যদি কেহ উপকৃত হইতে পারেন, ধন্য হইব।

শ্রীভবরঞ্জন তর্কতীর্থ

রঙ্গপুরের প্রাচীন কবি কাজী হায়াৎ মামুদের কাব্য পরিচয়।

অনন্যসুলভ মনীষাসম্পন্ন কত শত বাণীসেবক যে আমাদের দেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে আবির্ভূত হইয়া অখ্যাত অজ্ঞাতভাবে কাল প্রবাহে ভাসিয়া যান তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। রঙ্গপুরের প্রাচীন কবি কাজী হায়াৎ মামুদ এইরূপই এক প্রতিভাশালী বাণী-সেবক ছিলেন। সারস্বতনিকুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল ভাওয়াল কবি গোবিন্দ দাস যে দেশে কঠোর জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত ও দারিদ্র্যানলে দগ্ধ হইয়া তিলে তিলে মৃত্যুপথের যাত্রী হইয়াছেন, কবি রাজকৃষ্ণ রায়, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া কালের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছেন এবং যে হতভাগ্য দেশে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার জন্য প্রতিভা পূজার অনুষ্ঠান হইতে পারে না সে দেশে কবি হায়াৎ মামুদ যে এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণ অনাদৃত ভাবে লোক লোচনের অগোচরে পড়িয়া রহিয়াছেন তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? তবে পরম আনন্দের বিষয় এই যে বিগত ১৩২৩ সালে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ মৃত কবির স্মৃতি পূজায় অগ্রণী হইয়া পালিচরার ভূম্যধিকারী উদার মতি খান মোজাফর হোসেন চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে পীরগঞ্জ থানার অধীন ঝাড়বিশিলা গ্রামে অবস্থিত কবির সমাধির উপর একটা মর্ম্মর ফলক সংযুক্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত কবির গ্রন্থরাজি মুদ্রিত হইয়া সাধারণ্যে প্রকাশিত না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ ও রঙ্গপুরবাসীর কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণই রহিয়া যাইবে। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রথম আবিষ্কৃত ১২১৮ সালের হস্তলিখিত পুঁথি রঙ্গপুর অধিবাসী দ্বিজ কমল লোচন বিরচিত শক্তি বিষয়ক গ্রন্থ 'চণ্ডিকা বিজয় কাব্য'কে কীটদংষ্ট্রা হইতে উদ্ধার করিয়া বগুড়ার সাধক কবি গোবিন্দ চৌধুরীর "সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলি" নামক অধ্যাত্মতত্ত্ব মূলক গীতাবলী ও প্রাচীন কবি অদ্ভুতাচার্য্যের কৃত রামায়ণের আদ্যকাণ্ড প্রচারিত করিয়া পরিষৎ বঙ্গভাষাভাষিগণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, আশা করা যায় এইরূপে সাহিত্য রসিক সহানুভূতিশীল বঙ্গবাসিগণের অর্থানুকূল্যে পরিষৎ কবি হায়াৎ মামুদের গ্রন্থরাজিও মুদ্রিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন, নচেৎ সেগুলি অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইয়া বিস্মৃতির কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে। অধিকাংশ গ্রন্থই অতি জীর্ণ ও অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের লিপি উদ্ধার করা অসম্ভব। মাত্র দুইখানি গ্রন্থ এখনও ব্যবহার্য্য ও মুদ্রণযোগ্য আছে। অবিলম্বে এ দুইটীর রক্ষায় জনসাধারণের মনোযোগী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার গ্রন্থগুলি হইতে এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর রাজত্বে রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অধীন ঝাড়বিশিলা নামক গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম শেখ কাবিল, ভ্রাতার নাম শেখ জামাল। তাঁহার জন্মপল্লী প্রথমে ইতিহাস প্রথিত * ঘোড়াঘাট সরকারের অন্তর্গত সুলঙ্গ বাগ্‌দ্বার বা বাগ্‌দুয়ার ছিল, কালক্রমে ইহার অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে থানা উঠিয়া পীরগঞ্জে যায়। ঝাড়বিশিলা গ্রাম এককালে জনবহুল ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল, হিন্দু মুসলমান অধিবাসিগণ নিরুদ্বেগে পরমানন্দে প্রীতিবদ্ধ হইয়া বাস করিত; উৎসব কল্লোলের বিপুল উচ্ছ্বাস অহর্নিশ পল্লীর বুকের উপর দিয়া বহিয়া যাইত, কিন্তু কালপ্রভাবে ইহা শ্রীহীন ও হীনাবস্থ হইয়া পড়ে, শ্যাম সুষমাময়ী প্রকৃতির লীলা নিকেতন পল্লীর ক্ষুদ্র কোমল বুকে চঞ্চলা কমলার নুপুর শিঞ্জন স্তব্ধ হইয়া যায়—এইরূপেই সহস্র সহস্র বঙ্গ-পল্লী বীভৎস শ্মশানে পরিণত হইয়া শিবাকুলের আশ্রয়স্থল হইয়া পড়িয়াছে। কবি-রচিত "মহরমপর্ব্ব" ও 'জঙ্গনামা' নামক কাব্যদ্বয়ে কবির জন্মপল্লীর সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে :—

* * * *

"শুন আর নিবেদন, কহি আমি বিবরণ,
যেই মতে রচিনু পয়ার।
ঝাড় বিশিলা গ্রাম, চতুর্দ্দিকে যার নাম,
পরগণে সুলঙ্গা বাগ্‌দ্বার॥
সরকার ঘোড়াঘাট, কি কহিব তার ঠাট,
নানান্ বাজার ছিল জারে।
সে গ্রামে আমার ঘর, আছে লোক বহুতর,
ছাওয়াল পণ্ডিত বলি তারে॥
বসতির নাহি সীমা, দিব কি তার উপমা,
অমরা জিনিয়া গ্রামখানি।
যথা তথা রসরঙ্গ, নাহি জানে প্রিত ভঙ্গ,
একো জন গুণে মহাগুণি॥"

* তারিখ-ই বদাউনি ও তারিখ-ই আকবরী গ্রন্থে উল্লিখিত কাকসেলানদিগের বিদ্রোহের জন্য প্রসিদ্ধ। এই সরকার বর্ত্তমান দিনাজপুরের অংশ, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলা লইয়া গঠিত। আকবরের সময় এখান হইতে ৯০০ অশ্বারোহী ও ৩২৫০০ পদাতিক সেনা সংগৃহীত হইতে পারিত। Vide Gladwin's Ayeen-i Akbari Vol II. Part II. Pages 459-473.

কবির সমস্ত কাব্যই পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের মিশ্রণে রচিত ; সবগুলির ভাষাই প্রাঞ্জল ও প্রসাদ-গুণবিশিষ্ট এবং ছন্দস্রোত সাবলীল। রচনা মৌলিক নয়, পারস্ত বা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ, কিন্তু অনুবাদের মধ্যে কৃতিত্ব আছে—মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার মত কবির রচনাতেও ক্রিয়াপদের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন,

জানিলাম	স্থলে	'জানিলাঙ্'
করিলাম	"	করিলাঙ্
রচিলাম	"	রচিনু
খাইয়া	"	খাএয়া
কিরূপে	"	কেমতে, কেমনে
আমি	"	মুঞি
কত	"	কতেক।

প্রাদেশিক ও বৈদেশিক শব্দেরও প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয় যথা,—গেড়ি, ফরজ, দোজকি, ছাওাল, পচাল, কেতাব, আরজ, পাকার, হালাল, হারাম, সিরস্তানা, দিল ইত্যাদি। অনেক প্রাচীন রচনার ন্যায় কবির কাব্য গ্রন্থগুলিতে বর্ণনাশুদ্ধির প্রাচুর্য্য এবং বানানের বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়।

গ্রন্থ-পরিচয়।

(১) মহরম-পর্ব্ব।

এই গ্রন্থখানি নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর শাসনকালে ১১৩০ বঙ্গাব্দে বা ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, ১২৩৩ সাল বা ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে চকবড়ুলের অধিবাসী সেখ দাওর বক্স ইহার প্রতিলিপি করিয়াছেন। ইহা যে ফারশী হইতে অনুদিত তাহা কবির উক্তি হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি হয় :—

"হেয়াৎ মামুদ কহে নিবাস বাগদার,
ফারশীর কথা কৈল পুস্তকে প্রচার"

মহরম মাসে ফোরাত নদীর তীরবর্ত্তী কারবালার দিগন্তব্যাপী মরুপ্রান্তরে মাবিয়া পুত্র দুরাত্মা এজিদের প্ররোচনায় সীমার কর্ত্তৃক হজরৎ এমাম হোসেনের সৈন্য সহ নৃশংস হত্যার মর্ম্মভেদ বিষাদময় শোণিতসিক্ত কাহিনী লইয়া কাব্যের উপাখ্যান ভাগ রচিত হইয়াছে।

(২) হিত-জ্ঞান।

রচনার কাল সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন :—

* * * *

"বৃদ্ধি যোগে ভাবি বাণী, বিরচিনু এহি পুঁথি,"

সন ১১৬০ এগার শত্র সাইট্ সালে।—১১৬০ সাল বা ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। ইহা পারসী গ্রন্থের অনুবাদ।

"একশত ত্রিশজন ফরজ মসল্লা।
ফারসী আছিলো আমি করিলাও বাংলা॥"

গ্রন্থের অনুলিপির তারিখ ২৭শে বৈশাখ শুক্রবার ১২২৫ সাল বা ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ; অনুলিপিকার—সেখ নজর মামুদ, পরগণা কোছাড়, সরকার কোচবিহার, সাকিন বেড়া, চাকলে কাজির হাট।

কবি মুসলমান সম্প্রদায়ের নৈতিক অধোগতিতে ব্যথিত হইয়া নীতি-শিক্ষা প্রচার-কল্পে গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন :—

* * * *

"না বুঝে দিলের কথা, জেমত হুকুম জথা,
কিতাব কোরাণ নাহি চিনে॥
ত কারণে লেখি নিত অল্প অল্প জতোচিত,
বিরচিনু দিলের কাহিনী।
পুস্তকের সমাগতে ভাবিয়া আপন চিতে
নাম থুইলাম হিতগ্যান বাণী॥"

* * * *

গ্রন্থখানি সৃষ্টি বিবরণ, মূর্ত্তি পূজার নিন্দা, স্নান ও ধৌতি বিধি উপাসনা পদ্ধতি, পয়গম্বরগণের বিবরণ, মুসলমান সম্প্রদায়ের সদাচার সম্বন্ধীয় নানারূপ বিধি নিষেধ, হারাম ও হালালের বিবরণ, খাদ্যাখাদ্য বিচার, গুরু শিষ্যের লক্ষণ নির্ণয় প্রভৃতি মুসলমান সম্প্রদায়ের অবশ্য জ্ঞাতব্য নানা তথ্যে পূর্ণ। গ্রন্থখানিকে ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য অবিলম্বে ইহার মুদ্রণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গ্রন্থখানির রচনা ও নীতি উপদেশের সামান্য নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। 'সরিয়াৎ' বা ধর্ম্মাচরণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিভিন্ন পন্থাবলম্বনে সাধ্যের উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ অধ্যাত্ম জীবনে উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহারই বিভিন্ন ক্রম কবি উপমা দ্বারা বুঝাইবার প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

"সরিয়ৎ গোড় জানো বৃক্ষ্য তরি কত।
হকিকত ডাল তার ফল মারফত॥
গোড় দিয়া চড় ভাই বৃক্ষের উপর।
ডালে বসি খাও ফল ভরিয়া উদর॥
গোড় দিয়া না চড়িলে কে পারে চড়িতে।
হাতে নাই পাএ ফল খাইবো কেমতে॥

গোড় সে জোগায় সার ফল ধরে ডালে।
গোড় বিনে বৃক্ষ্য নহে ফলে কোন কালে ॥
ডালে বসি ফল খাএয়া মত্ত হও জদি।
না রহে বৃক্ষের কায়া ডাল মূল আদি।

*

"পর ধন পর নারী হরে জেবা জন।
হরিয়া ছলিয়া খাএ ধর্ম্মে নাহি মন ॥
পরঘাতী আত্যঘাতী হয় মন্দোকারী।
হালাল হারাম কিছু না খাএ বিচারি ॥
মিথ্যা নিন্দাক্রি করে কারো মির্থ্যা দেএ সাক্ষি।
সর্ব্বথা এ সবো লোক হইবো দোজকি।"

"কার পুত্র কার পিতা কার সোহদর।
আপন আপন সবো অন্তরে অন্তর ॥
কার ইষ্ট কার মিত্র কার কেহ নয়।
এ তনু আপন নহে জানিলাঙ্ নিশ্চএ ॥'

*

ইহাতে পরমহংস শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের

'কস্ত্বং কোঽয়ং কুত আয়াতঃ'
কা মে জননী কো মে তাতঃ
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং
বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিকারং

প্রভৃতি বৈরাগ্যোদ্দীপক উদাত্ত গম্ভীর বাণীর প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই উল্লিখিত কথা গুলিতে যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় আছে।

(৩) আম্বিয়া বাণী

আম্বিয়া শব্দ 'নবী' (অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরিত দূত) শব্দের বহু বচন। সৃষ্টির আদি মানব মানবী আদম ও হাওয়ার উৎপত্তি, তাঁহাদের বিবাহ, নিষিদ্ধ ফল-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ পাপে তাঁহাদের স্বর্গচ্যুতি, পৃথিবীতে নির্ব্বাসন ও বাস, পৃথিবীতে নবীর লীলা, ইব্রাহিম খলিলের জন্ম-কথা প্রভৃতি বৃত্তান্ত কবি অতি সুললিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থ রচনায় কবির অহমিকারও ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়:—

"আম্বের কাহিনী সুন্দর পুঁথি আম্বিয়া বাণী।
পদ বন্ধো করি আমি কিতাবে জেবা জানি ॥

অন্য অন্য লোকে পূর্ব্বে কহিছে বিস্তর।
সুললিত নহে স্বর, নহে সমস্বর ॥"

গ্রন্থখানি বঙ্গের সুবাদার আজিম উশ্বানের রাজত্বকালে কবির জন্মপল্লী ঝাড় বিশিলাতে ১১০৬ সালে বা ১৭০০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়।

কাব্যে অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের (hyperbole) এত বাহুল্য দেখা যায় যে তাহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও হাস্যোদ্দীপক বলিয়া মনে হয়, যথা—

* * *

"জেহি মাত্র পয়গম্বর কহিল বদনে।
পাথর হইতে শব্দ উঠিল তখনে ॥
প্রসবের কালে যেন কাঁদে প্রসবতি।
সোহি মত পাথর কাঁদিতে লাগে অতি ॥
ফাটীল পাথর খান কাঁদিতে কাঁদিতে।
উট বাহিরায় তবে তার ভিতর হৈতে ॥"

এগুলি ভিত্তিহীন ও স্বকপোল কল্পিত কিনা, অথবা এরূপ কিংবদন্তী বা প্রবাদ সত্যই প্রচলিত আছে কিংবা চিত্তগ্রাহী করিবার উদ্দেশ্যে এরূপ অস্বাভাবিক বর্ণনার অবতারণ করা হইয়াছে তাহা সুধী মুসলমান ভ্রাতৃগণের বিবেচ্য।

গ্রন্থে মানব সমাজের হিতকর বহু নীতি উপদেশ প্রচারিত হইয়াছে ; যথা—

"মাতা পিতা গুরুজন না মানে যে জন
অবশ্য হইবে সেহি দোজখে দাহন ॥
"পর নিন্দা, পর-হিংসা করে যে অকর্ম্ম।
ভালো মোন্দ না বিচারে করিয়া অধর্ম্ম।
দোজখে হইব সেহি পাপীর দুর্গতি। §
কাটিব তাহার জিভ্যা আবলের কাতি ॥

* *

"প্রজা পীড়া করে যেবা হয়্যা নরপতি।
দোজখে পাইব দুঃখ সেহি নানা জাতি।

* *

"পরের সম্পদ দেখি হিংসা করে যে,
দোজখে পাইব অতি দুঃখ তাপ সে।

* *

"আরজে পণ্ডিত হয়্যা কাহাকে না বুঝাও।
শাস্ত্র অপরূপ কথা কাহাকো জানাএ ॥

---

* নরক।

দোজখে হইব তার বহু বিড়ম্বন।
না করিল না কহিল না জাত্রেতা যেমন॥"

(৪) চিত্ত উত্থান পুঁথি।

বিষ্ণু শর্ম্মা প্রণীত সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থ ফারসীভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, কবি তাহাই স্বাধীনভাবে বঙ্গভাষার ছন্দে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কবি স্বয়ং গ্রন্থ রচনার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেনঃ—বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশ গ্রন্থের খ্যাতি শুনিয়া 'মুস্তাফা দেওয়ান' নামক একব্যক্তি 'তাজল-মুল্ক' নামক লেখককে উহা পারস্যভাষায় অনুবাদ করিতে আজ্ঞা দিলে তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়া উহার নাম—"মদ্‌রে কুল্ কুলুব্ (অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব) রাখেন। কবি হায়াৎ মামুদ উহাকে বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করেন। তিনি গ্রন্থের অবতরণিকা এইরূপ ভাবে দিয়াছেন :—

"বিষ্ণুরাম বিরচিত, ছিল পুঁথি নাগরিত,
হিত-উপদেশ নাম তার।
চারিখণ্ডে এহি পুঁথি বিরচিল দ্বিজপতি,
প্রতিখণ্ডে নানাখণ্ড তার॥
একখণ্ডে কত খণ্ড, এহি পুঁথি চারিখণ্ড,
কথা মধ্যে কথার পত্তন।
শত ফুলে মালা যেন, হার নাহি গাঁথি তেন,
সেহি মতে কর্ণ সুশোভন॥

* * *

পূর্ব্বখণ্ড মিত্র লাভ, জাতে নাহি ভিন্ন ভাব,
মিত্র হ'য়ে করে জত হিত,
দ্বিতীয়েতে সুহৃদ্‌ভেদ, জগতে হয় মিত্রচ্ছেদ।
দুইজনে হয় সে অমৃত॥
তৃতীয় খণ্ড মায়া মানে, রণজয় বুদ্ধি জ্ঞানে,
ভণ্ড পড়ে বৈরীর সমপাস॥
চতুর্থেতে সিদ্ধাখণ্ড, জাতে হয় সুদ্ধ ভাণ্ড,
দুই রাজা সংগ্রামের শেষ॥"

* * *

§ সংস্কৃত কর্ত্তরী শব্দের অপভ্রংশ—অর্থ ক্ষুর, খড়্গ। উদাহরণ—ভারতচন্দ্র—"কাতি দিব গলে, প্রবেশিব জলে, অনলে ত্যজিব প্রাণ।"

কবিকঙ্কণ মুকুন্দ রাম,—শত শত সেনাপতি, হাতে করি ঢাল কাতি,
আছে তার অঙ্গন বেষ্টিত।"

গ্রন্থ রচনার কাল—বঙ্গাব্দ ১১৩৯

"সর্ব্বভেদ নামে পুঁথি, শ্রম করি দিবারাতি,
বিরচিনু ছাড়িয়া আলিস, ‡
কহি সে সালের কথা, জাতে বিরচিনু পোথা, §
সন এগার সও উনচাল্লিশ ॥"

ইমাম বক্স সরকার কৃত ইহার প্রতিলিপি বঙ্গাব্দ ১২৬৬ বা খৃষ্টাব্দ ১৭৬০।

মূল উপাখ্যান ভাগ যথাসাধ্য অবিকৃত রাখিয়া কবি গ্রন্থোক্ত, চরিত্রগুলির নাম ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, যথা—বিষ্ণুশর্ম্মার স্থানে বিষ্ণুরাম, সুদর্শন রাজার স্থানে চন্দ্র সেন, চিত্রগ্রীব কপোত কর স্থানে চিত্র গেরু ইত্যাদি।

কবির অনুবাদের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। ইহাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা যায় না, মূল ভাবটি ঠিক রাখিয়া মনোরম ও বোধগম্য করিবার জন্য কতকটা স্বাধীনভাবেই বঙ্গভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন মাত্র বলা যাইতে পারে। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া হইল :—

সংস্কৃত—"অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে।
ছেত্তুঃ পার্শ্বগতাচ্ছায়াং নোপসংহরতে দ্রুমঃ"
"যেহি গাছ কাটিবারে সূত্রধর যায়।
সেহি গাছ তলে গিয়া ছায়াতে দাঁড়ায় ॥
গাছ তাকে জানে এই আইল কাটিবার।
তবুও সে ছায়ান্তর না করে তাহার ॥"

সংস্কৃত—"ধনবান্ বলবান্ লোকে সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
প্রভুত্বং ধনমূলং হি রাজ্ঞামপ্যুপজায়তে ॥

ইহার ভাবান্তর :—
ধনহীন বলহীন কহে সর্ব্বলোকে।
নির্ধনীর মূল্য কেহ না করে ফরাকে ॥ *
যাকে বিধি দিল ধন সেহি বলবান্।
পর্ব্বত তুলিতে পারে কোন্ বস্তু জ্ঞান ॥"

সংস্কৃত—"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি ॥

উহার ভাষান্তর—"অর্দ্ধ পিঠা ছাড়ি যে গোটার লাগি ধায়।
কাহাকো না পায় শেষে উভয়ই হারায় ॥"

সংস্কৃত—"পয়ঃ পানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায় ন শান্তয়ে ॥"

ভাষান্তর—"উচিত বচন মোর মন্দ লাগে তাকে।
দুগ্ধ বিষ হৈল যেন পড়ি সর্প মুখে ॥"

‡ আলস্য § পুঁথি। * আরবী 'ফরাগৎ শব্দ, অর্থ পার্থক্য।

৫। জঙ্গ নামা।

নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁর রাজত্বের শেষভাগে ১১৩০ বঙ্গাব্দ বা ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ কবির জন্মপল্লীতে রচিত হয়। ইহার একস্থলে ১১৯৭ সাল, ১১ই চৈত্র, মঙ্গলবার পুঁথি সমাপ্ত হইবার কথা আছে। ইহা যে অনুলিপির তারিখ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ গ্রন্থ রচনায়ও কবির অহমিকা জ্ঞানের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়, যথা :—

"নাহি জানে আদ্দ কথা নাহি পায় তত্ত্ব।
পচাল * পাড়িয়া মিথ্যা ফিরে সত্য সত্য ॥
তাহা শুনি মনে মোর দিধা সর্ব্বক্ষণ ;
রচিনু পুস্তক তবে জানিতে কারণ ॥
জেবা নাহি জানে শুনে কেতাবের বাণী।
এবে সে জানেব লোকে তত্ত্বের কাহিনী।"

* * *

আলোচ্য গ্রন্থ ও পূর্ব্বোক্ত 'মহরম পর্ব্ব' নামক গ্রন্থ উভয়েরই রচনার বিষয় এক ও অভিন্ন—কারবালা প্রান্তরের শোণিতলিপ্ত শোকাবহ, নিষ্ঠুর হত্যা কাহিনীর বিবৃতি; তবে 'মহরম পর্ব্ব' গ্রন্থ হইতে 'জঙ্গ নামার' বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কবি প্রবাদ অনুযায়ী প্রতিপক্ষদ্বয়ের বংশ পরম্পরায় আগত বিবাদের মূলীভূত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং হজরৎ এমাম হাসান ও হোসেন এবং এজিদ্ পর্য্যন্ত একটা বংশ তালিকা দিয়াছেন। সুধীগণের অবগতির জন্য এ অংশ অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

* * *

"এমামে এজিদে জুদ্ধ কোন্ প্রয়োজন।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ আছে খণ্ডিব কেমন ॥
তাহার নিশ্চয় কথা সুন দিয়া চিত।
আবদুল্লা মন্নাক ছিল সংসারে বিদিত ॥
দুই পুত্র হৈল তার একত্র ভূমিষ্ট।
দেখিল দুহার লাগি আছে পিঠে পিষ্ঠ ॥
টানাটানি করে কেহ খসাইতে নারে ;
বিমচন কৈল তারে খড়্গের প্রহারে ॥
সেহিত রহিল খড়্গ দুহার মাঝার।
জুবা কালে দুহে জুর্দ্ধ করিল অপার ॥
হাসিম উম্মিয়া নাম রাখিল দুহার।
সর্ব্বকাল গেল জুদ্ধ করিতে তাহার ॥

---

* অশ্রাব্য ও অকথ্য গালি দিয়া অথবা বাচালতা করিয়া।

হাসিমের পুত্র হৈল আবদুল্ল্যা মতলব।
উম্মিয়ার পুত্র হৈল নামেতে হরব ॥
মতলবে হরবে পুন কৈল মহামার।
রাত্রি দিবা বৈরিভাব রহিল দুহার ॥
মতলবের পুত্র হৈল নামেতে আবদুল্ল্যা
হরবের পুত্র নাম সফিয়া থুইলা ॥
আবদুল্ল্যা সফিয়া সেহ রাখিল থাকার।
দুই ভাই কৈল জুদ্ধ বিবিধ প্রকার ॥
আবদুল্ল্যার পুত্র হৈল নবি পেগাম্বর।
সফিয়ার ঘরে হৈল মাবিয়া সুন্দর ॥
দিনের মালেক হৈল মহাম্মদ নবি।
মাবিয়া থাকিল তাকে রাত্রে দিনে সেবি ॥
মস্তফার নাতি হৈল হাসন হুসন।
মাবিয়ার পুত্র হৈল এজিদ দুর্জ্জন ॥"

* * *

পরিশেষে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ চিত্রশালায় পরিরক্ষিত অপর একখানি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। এ গ্রন্থখানির নাম "ফকির বিলাস ॥" রচনার তারিখ ১৬ই বৈশাখ শনিবার ১২৬৮ সাল, রচয়িতা সাহা হায়াৎ মামুদ। নামের সাদৃশ্যে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। জঙ্গনামা প্রভৃতির রচয়িতা হইতে ইনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি, উভয়ের আবির্ভাব কালের মধ্যে প্রায় এক শতাব্দীর ব্যবধান বর্ত্তমান থাকায় ও রচনার বিভিন্নতা দৃষ্টে ইহাই স্পষ্টতঃ প্রতীত হয়।

স্বামী বেদানন্দ ও মেধসাশ্রম।

শাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে করিতে, এমন মহাপুরুষের দর্শন ও কৃপালাভ হইয়া থাকে, সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষভাবে শাস্ত্রবাক্য ও শাস্ত্রের উপদেশ যে জলন্ত সত্য বিশেষ ভাবে তাহা প্রমাণ করাইয়া দেয়, এখন তেমন বিশ্বাসী ভক্ত ও সচরাচর মিলেনা, আর তেমন উৎসাহ দাতা গুরুও সহজে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাই বলিয়া শাস্ত্র বাক্যে কদাচ অবহেলা বা অবিশ্বাস করা সঙ্গত নয়। অদ্যকার প্রবন্ধোক্ত স্বামী বেদানন্দ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া যে

* দিল্লা, কেলেঙ্কার।
বিদ্যাপতি—"কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকার।"

অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই অগুকার প্রবন্ধে বিবৃত করিলাম। গৃহস্থ আশ্রমে স্বামীজির নাম ছিল চন্দ্রশেখর। ইঁহার মাতামহ ও মাতামহী চন্দ্রনাথে গিয়া তাঁহাদের কন্যার একটী পুত্র কামনা করেন। তাহার পর—তিন কন্যার পর—ইঁহার জন্ম হয়। শীতলচন্দ্র নামে ইনি সম্বোধিত হইতেন। বরিশাল জেলার অন্তর্গত গৈলাগ্রামে সামবেদোক্ত কুথুমীশাখীয় বৈদিকশ্রেণী সাবর্ণ ব্রাহ্মণদের বাস ছিল। সেই বংশে, ১২৬৬ সনে, ২৫শে অগ্রহায়ণ, পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রশেখর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা জগদ্বন্ধু একজন পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার প্রপিতামহ রামকৃষ্ণ ন্যায়পঞ্চানন পূর্ব্বাঞ্চলে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও পৌরাণিক ছিলেন। চন্দ্রশেখরের ২ বৎসর বয়সের সময় পিতা পরলোক গমন করেন, বাল্যকালে পাঠশালায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া গৈলাগ্রাম নিবাসী ৺মদনমোহন কবীন্দ্রের নিকট এবং বিক্রমপুর নিবাসী কেদারনাথ পদরত্নের নিকট কলাপব্যাকরণ সমগ্র অধ্যয়ন করিয়া "বিগ্যাভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হন এবং হরিনাভি নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং ৺কাশীধাম গমন করিয়া ৺সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রী ও দণ্ডী ৺নারায়ণ শাস্ত্রীর নিকট দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন পরে বর্দ্ধমান রাজ চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিতবর ৺হরিনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের নিকট কিছুকাল দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "বেদান্ত ভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হন ও তদবধি শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং "বেদান্ত বিজয়" এবং "বেদান্ত রত্নাকর" দুইখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বেদান্ত বিজয়ের সংস্কৃত ভাষা অন্যান্য দর্শনের মত খণ্ডন করিয়া বেদান্ত মত সংস্থাপিত হইয়াছে। ৺পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমুলর এই বেদান্ত বিজয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। বেদান্ত বিজয়ের বিষয় বেদান্তরত্নাকরে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। বেদান্ত ভূষণ মহাশয় কিছুকাল কলিকাতা থাকিয়া অধ্যাপনা করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের জজ স্বর্গীয় সার রমেশচন্দ্র মিত্র, টাকীর জমিদার ৺যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এটর্নি শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাগবাজার নিবাসী জমিদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী শ্রীমতী সরলা দেবী প্রভৃতি ইহার নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে, ইনি বাঁকীপুরের প্রসিদ্ধ উকিল ভাগবত পরায়ণ ৺পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহের বিগ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনার নিমিত্ত নীত হয়েন, ও কিছুদিন তথায় অধ্যাপনা করেন। বেদান্তভূষণ মহাশয়ের মেধা যেমন অসাধারণ ছিল, তাঁহার স্মৃতি শক্তিও সেইরূপ প্রখর ছিল। ব্যাকরণ হইতে বেদান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত অধ্যয়ন, উল্লিখিত রূপে, সর্ব্বসমেত দুই বৎসরের মধ্যে সমাধা হয়। শ্রীশঙ্করের শক্তি ভিন্ন এত অল্পকাল মধ্যে দর্শন শাস্ত্রে এরূপ অভিজ্ঞতা সম্ভব নহে। শৈশব ও বাল্যকাল দারিদ্র্য-দুঃখ সংঘাতে অতিবাহিত করিয়া, যৌবনে স্বল্পকাল মধ্যে শাস্ত্রে এরূপ অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ কিরূপে সংঘটন হইল, জানিতে কৌতূহলপর হইয়া আমরা ইঁহার জন্মপত্রিকা আনাইয়া দেখিয়াছি। গ্রহ সমাবেশ মধ্যে, লগ্নে শনি; তৃতীয়ে বুধাদিত্য যোগ; দশমে চন্দ্র তুঙ্গী; একাদশে গুরু তুঙ্গী। ক্ষেত্র সিংহাসন যোগও আছে। তাহার ফলও ফলিয়াছে। বেদান্তভূষণ মহাশয় 'ঘোষ যাত্রা" ও "লক্ষ্মণ শক্তিশেল" নামে ২ খানা সংস্কৃত নাটক লিখিয়াছেন। এতদিন বেদান্তভূষণের

পাণ্ডিত্যাভিমান প্রবল ছিল। কিন্তু এইবার জীবনস্রোত আবার অন্যদিকে ধাবিত হইতে চলিল। বাঁকীপুর হইতে ফিরিয়া বেদান্তভূষণ "বিবেক বিলাস বা সপ্তলোকাভিনয়" নামক একখানি বেদান্ত নাটক রচনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যের প্রকটন হইতে থাকে। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার সাহায্যে বেদান্তাদি শাস্ত্রের প্রচারোদ্দেশে ও স্বর্গীয় পিতার স্মৃতির জন্য মাদারীপুরে "জগবন্ধু" সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র শশধর ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় কলেজের সম্পাদক ছিলেন। এই সৎকার্য্য সাধনের জন্য বেদান্তভূষণ মহাশয়ের নিজের কোন অর্থ সঞ্চয় ছিল না। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী গুরুদক্ষিণা স্বরূপ যে ১৬/০ বিঘা জমি দেন ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তি দেন তাহাই তখন সম্বল ছিল।

মাদারীপুরের তৎকালীন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সিফগণ এবং স্থানীয় কতিপয় ভদ্রলোকে তাঁহার বিশেষ সহায় হয়েন। কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া কলেজে সাহায্য করিতেন।

ক্রমে কলেজে বহু ছাত্র সমাবেশ হইল। ছাত্রগণ বিনাবেতনে পড়িত ও আহার পাইত। সুতরাং কলেজের ব্যয় যথেষ্ট হইতে লাগিল। স্থানীয় প্রতি পরিবারের নিকট সাপ্তাহিক মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ হইত ও বেদান্তভূষণ মহাশয় স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহকল্পে বেদান্ত প্রচার দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেন।

এই উপলক্ষে তাঁহার চট্টগ্রাম যাত্রা। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। চট্টলে এক মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রজনী যোগে কিয়ৎকাল নিভৃত আলাপের পর, বেদান্তভূষণের পণ্ডিতাভিমান বিদূরিত হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার যোগজ ধর্ম্মোন্মীলনের সময় সন্নিকট। যোগীর সহিত সাক্ষাতের পর তিনি চন্দ্রনাথে গমন করেন। সে সকল বৃত্তান্ত তাঁহার রচিত "চন্দ্রশেখর মাহাত্ম্য" পুস্তকে উল্লিখিত আছে। চন্দ্রনাথে সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মে।

চন্দ্রনাথের মোহান্ত কিশোরীবন মোহান্ত মহারাজ এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। স্বামীজীর নিকট শুনিয়াছি, "কিশোরীবন মোহান্ত মহারাজ একজন পরম রাজযোগী পুরুষ ছিলেন ও গান্ধর্ব্ব বিদ্যায় সুনিপুণ ছিলেন। যখন তম্বুরা লইয়া তিনি স্বরচিত সঙ্গীত গাহিতেন—

"কুল কুণ্ডলিনী যার জাগে,
কি করিবে আর তার শত জপ যোগ যাগে।
অন্তরে যাঁর শ্যামা পদ, বাহিরে তাঁর শ্যামা পদ,
সে কেন অপর পদ মাগে।
অশেষ সুখ সম্পদ, ইন্দ্রেরই ঐশ্বর্য্য পদ,
ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবপদ দিলে কি তার মনে লাগে।"

তখন ঘোরতর বিষয়ীরও বিষয় বিভব তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। জ্ঞান ও ভক্তি একাধারে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার প্রসন্ন বদন ও মধুর আলাপ, আর্ত্ত জনের হৃদয়ে শান্তি ধারা ঢালিয়া দিত। সন্ন্যাসি সেবা তাঁহার পরমব্রত ছিল। চন্দ্রনাথের বিপুল অর্থ, তিনি সন্ন্যাসি সেবায় অকাতরে ব্যয় করিতেন। সন্ন্যাসীগণ তাঁহাকে পিতা মাতা সদৃশ জ্ঞান করিতেন। বাহ্য-ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার নিন্দা রটাইতে, স্বার্থপর লোকে কুণ্ঠিত হয় নাই; এবং লোভ বিমূঢ় ধর্ম্ম বিহীন লোকের শত শত ঈর্ষা-অসি তাঁহার অনিষ্টার্থে উত্তোলিত হইলেও, সেই মহাপুরুষের কিছুমাত্র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই।"

যোগিগণ সহবাসে বেদান্তভূষণ অলৌকিক দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। সংসার মিথ্যা বোধে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা ও পত্নী বর্ত্তমান। পত্নীর অনুমতি বিনা সন্ন্যাস সম্ভব নহে। বেদান্ত ভূষণ গৃহে নীত হইলেন। সাধ্বী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পতিসহ সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্যুক্ত হইলেন। বেদান্তভূষণ পত্নীকে বুঝাইলেন। পুত্র কন্যা পালন মাতার ধর্ম্ম বুঝিয়া, সতী সে অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন, এবং পরম নিঃস্বার্থভাবে পতিকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অনুমতি দিলেন। বেদান্ত ভূষণ পত্নীর অনুমতি লইয়া চট্টলে ফিরিলেন। তাঁহার পর কিশোরীবন মোহান্ত মহারাজ তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া শ্রীশঙ্কর পরিবারের "বন" সম্প্রদায়ভুক্ত করেন ও বেদানন্দ স্বামী নাম দেন

সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী মেধসতীর্থ আবিষ্কার করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। এই চণ্ডীতে "মেধস্ ঋষির" আশ্রমের কথা উল্লিখিত আছে। সেই আশ্রমে সুরথ রাজা ও সমাধি নামক বৈশ্য স্বজন কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। তথায় মেধস্ ঋষির নিকট দেবী মাহাত্ম্য অবগত হইয়া তাঁহারা দেবীর পূজা করেন, এবং সেই পূজায় দেবীকে প্রসন্ন করিয়া অভিলষিত বর লাভ করেন।

এই আশ্রমের সন্নিকটে ত্রিকালদর্শী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম। সেই স্থানেই মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ক্রোষ্টুকীকে মেধসঋষি উক্ত এই দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছিলেন। সেই মহাতীর্থ স্থান মেধসাশ্রম কোথায়, কোনও পুরাণে তাহার উল্লেখ নাই। কিন্তু তন্ত্রে সেই আশ্রমের কথা উল্লিখিত আছে। গৌরতন্ত্রে কামাখ্যা পটলে এই আশ্রমের বিবরণ উল্লিখিত আছে। যথা—

"কর্ণফুলী মহানদী গো পর্ব্বত সমুদ্ভবা।
তস্যাশ্চ দক্ষিণে তীরে পর্ব্বতঃ পুণ্যবিত্তমঃ
তত্র দশ মহাবিদ্যা গঙ্গানাস্তি স্বরূপিণী।
মার্কণ্ডেয় মুনেঃ স্থানং মেধসো মুনেরাশ্রমঃ॥
তত্র চ দক্ষিণা কালী বাণলিঙ্গং শিবঃ স্বয়ং॥

ইহা ব্যতীত যোগিনী তন্ত্রে এই মার্কণ্ডেয় আশ্রমের কথা এবং তৎসন্নিহিত চতুর্দ্দিক্ পরিমিত মার্কণ্ডেয় কুণ্ড ও মার্কণ্ডেয় পদচিহ্ন ইত্যাদি উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী প্রথমে শাস্ত্রোক্ত এই সকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া যোগ সাহায্যে এই মেধসাশ্রমের

সন্ধান পান। সেই আশ্রম উক্ত শাস্ত্রোক্ত চিহ্ন সহিত আজিও অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান আছে।। স্বামীজী বহু আয়াসে, বহু হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ নিবিড় অরণ্যসমাকুল পর্ব্বত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া, এই তীর্থ আবিষ্কার করেন।

এই আশ্রম চট্টগ্রামের নিকট অবস্থিত। ভদ্রপল্লী সারোয়াতলী হইতে এ আশ্রম দেখা যায়। চট্টগ্রাম হইতে সারোয়াতলী হইতে আশ্রম পর্ব্বতের সানুদেশ প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধান আশ্রমের শোভা অতি রমণীয়। সঘন শ্যামল তরুলতা শোভিত পর্ব্বতস্তরে মেধসাশ্রম। পর্ব্বতস্তরে নিম্নভাগে চম্পকারণ্য, চম্পকারণ্যের উভয় পার্শ্বস্থ পর্ব্বতবাহুর উপর দিয়া আশ্রমে উঠিবার পথ। বাম বাহুর বাম ভাগে নাভিগঙ্গা। ঐ গঙ্গা নাভি সদৃশী গভীর কুণ্ডাকারে বিরাজমান। সেই কুণ্ড মধ্যে পর্ব্বত নির্ঝরিণীর নির্ঝর-নিকর সুমধুর ধ্বনিতে অবিরাম ধারায় প্রবাহিত। জল অতি মধুর। পর্ব্বত সমীপবাসিগণ দেবতা-বোধে ঐ কুণ্ড পূজা করেন। তদূর্দ্ধে বিষ্ণু পদলাঞ্ছিত, শঙ্খ চক্রচিহ্নিত অনেক কুণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে। একটী কুণ্ড পার্শ্বে সর্প জড়িত শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান, নাভি গঙ্গার নিম্ন দেশে ত্রিশূল চিহ্নিত ব্যাসকুণ্ড, উপরিস্থ অধিত্যকা ভূমিতে মেধসাশ্রম। উহার দক্ষিণাংশে নানাবিধ সুরভি কুসুম কুঞ্জ ভূষিত সুরথকুণ্ড ও বৈশ্যকুণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে। আশ্রম সম্মুখে একটী প্রাচীন বিল্বতরু, ও চারিদিকে আমলকী কানন। ঐ আশ্রমের সন্নিহিত পূর্ব্বাংশে চতুর্ধস্থ পরিমিত মার্কণ্ডেয় কুণ্ড। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত নির্ঝরিণী দ্বিধা হইয়া এক ধারায় নাভিগঙ্গায় ও অপর ধারায় এই মার্কণ্ডেয় কুণ্ডে প্রবাহিত। মার্কণ্ডেয়কুণ্ডে কচ্ছপাকৃতি পাষাণ খণ্ড বিরাজিত। কুণ্ডের উপরিভাগে মার্কণ্ডেয় ঋষির পদচিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। তদূর্দ্ধে মার্কণ্ডেয় আশ্রম ও দশমহাবিদ্যার স্থান স্তরে স্তরে বিরাজমান। উভয় আশ্রমের দৃশ্য অতি মনোহর; আশ্রম পদে প্রবেশ করিলেই চিত্ত প্রসাদ উদ্ভব হয়। আশ্রমশোভা বর্ণনাতীত।

শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য পাইয়া এই মহাতীর্থে এই মার্কণ্ডেয় মেধসাশ্রমে দক্ষিণাকালীর এক টিনের ঘর প্রস্তুত করাইয়াছেন ও আশ্রম স্থান সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই আশ্রমের আজিও উপযুক্ত সংস্কার বা প্রচার হয় নাই।

আজ প্রায় ছয় বৎসর হইল স্বামীজী এই আশ্রম প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং দক্ষিণা কালীর ঘর প্রস্তুত করান এবং তাঁহার নিয়মিত পূজা নির্ব্বাহের জন্য অন্নদা চরণ সর্ব্ববিদ্যাকে ভার দেন। তাহার পর স্বামীজী সেখান হইতে চলিয়া যান।

তাহার পর তিনি চন্দ্রশেখর মাহাত্ম্য নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড লিখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব ছাত্র-মাদারিপুরের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বিজয় কিশোর মিত্র মহাশয়ের নিকট দেন। সে আজ দুই বৎসরের কথা। নানা গোলযোগে সে পুস্তকের রীতিমত প্রচার হয় নাই। যাহা হউক সেই গ্রন্থে মেধসাশ্রম আবিষ্কারের বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় সন্নিবেশিত আছে।

এক্ষণে যদি উল্লিখিত স্থান প্রকৃত মেধসাশ্রম ও মার্কণ্ডেয় আশ্রম হয় তবে তাহার উন্নতি ও প্রচার জন্য প্রত্যেক হিন্দুর যত্ন করা কর্ত্তব্য। উক্ত স্থান যে মেধসাশ্রম তাহা

সিদ্ধান্ত করিবার অনেক কারণ আছে। প্রথম কথা, তন্ত্র শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ আছে। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী যখন জঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া ঐস্থান আবিষ্কার করেন, তখন তন্ত্রোক্ত চিহ্ন সকল সে স্থানে বর্ত্তমান ছিল। এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে। তৃতীয়তঃ শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী বলেন যে, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর যোগস্থান কোথায় করিবেন; তাহা চিন্তা করেন। সেই সময় যোগস্থ হইয়া তিনি মেধসাশ্রমের কথা স্মরণ করেন। সেই সময় আশ্চর্য্য দৈব সাহায্যে, উক্ত গৌরতন্ত্রর গ্রন্থের একখানা পাতামাত্র তাঁহার হস্তগত হয়। তাহাতে তিনি ঐ শ্লোক দেখিতে পান। তখন তিনি মেধসাশ্রম আবিষ্কার জন্য সারোয়াতলীর নিকটস্থ নিবিড় বনাচ্ছন্ন পর্ব্বতমালার মধ্যে প্রবেশ করেন। এবং দৈববলে, ক্রমে ঠিক এইস্থানেই আসিয়া উক্ত তন্ত্রোক্ত মেধসাশ্রমের সমুদয় চিহ্ন দেখিতে পান। উক্ত গৌরতন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, কলিকালে উক্ত আশ্রম প্রকাশিত হইবে।

মহাতীর্থ শ্রীবৃন্দাবন ধাম লুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আজ্ঞানুসারে শ্রীরূপ সনাতন তাহা প্রথম আবিষ্কার করেন। সে আজ ৪০০ বৎসরের কথা। চন্দ্রনাথ ও আমাদের মহাতীর্থ স্থান। শাস্ত্রমতে কলিতেই তাহা তীর্থ হইবে। আজি প্রায় ৪০০ বৎসর মাত্র হইল চন্দ্রনাথ ও প্রথম আবিষ্কৃত হয় তীর্থ বলিয়া প্রচারিত হয়। আশা করা যায় যে এই মেধাশ্রমও সেইরূপ প্রধান তীর্থ বলিয়া সত্বর প্রচারিত ও আদৃত হইবে।

শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামী লিখিয়াছেন, এই মেধসাশ্রমই 'ভারত উদ্ধারের বীজ স্বরূপ'। তাহার প্রকৃত অর্থ কি, তাহা তত্ত্বদর্শিগণ ভাবিয়া দেখিবেন। যাহা হউক, এই মেধসাশ্রম সম্বন্ধে অনেকের মনে অনেকরূপ সন্দেহ হইবার সম্ভাবনা। সকল সন্দেহ দূর করা সম্ভব নহে। যাঁহারা শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামীর কথা বিশ্বাস করিবেন, তাঁহাদের কোনও সন্দেহ হইবে না। যাঁহারা উক্ত গৌরতন্ত্রের বচন বিশ্বাস করিবেন তাঁহারাও কোন সন্দেহ করিবেন না। উক্ত আশ্রমের তন্ত্রোক্ত চিহ্ন বিদ্যমান ছিল—তাহা কেহ তীর্থ সৃষ্টি জন্য জাল করিয়াছে ইহা বলিতে পারিবে না। ঐ সব চিহ্ন হইতে অন্ততঃ ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, কোন না কোন সময়ে ইহা তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীমদ্ বেদানন্দ স্বামীকে 'আপ্ত' বা বিশ্বাসার্হ বলিয়া স্বীকার করিলে অনেক সন্দেহ দূর হয়। মাদারিপুরে থাকিয়া শ্রীযুক্ত বিজয় কেশব মিত্র, তাঁহার যে জীবনী সংগ্রহ করিয়া উক্ত চন্দ্রশেখর মাহাত্ম্য গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ছিলেন, তাহাই উপরে উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে এইমাত্র উল্লেখ করা উচিত যে; এই মেধসাশ্রম সম্বন্ধে স্বামীজীর কোনরূপ স্বার্থ নাই মেধসাশ্রম আবিষ্কার ও দক্ষিণাকালীর স্থাপনা ও পূজার ব্যবস্থার পরে, তিনি সেখান হইতে চলিয়া যান। কয়েক দিন কাশীবাস করিয়া, আবার নর্ম্মদা, গিরনার, হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন। এখন তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

পরিশিষ্ট

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার পঞ্চবিংশ বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

১৩৩৭ বঙ্গাব্দে এই সভার কর্ম্ম জীবনের ষড়্বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইল। ১৩৩৬ বর্ষের সভায় সংক্ষিপ্ত কর্ম্মপরিচয় নিম্নে বিবৃত হইল—

আলোচ্যবর্ষে এই সভার হিতাকাঙ্ক্ষী কয়েকজন মনীষী পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বঙ্গের বিক্রমাদিত্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। তাঁহার ন্যায় হিতৈষী হারাইয়া সভার যে ক্ষতি হইয়াছে, আশা করি, তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী এম্ এ, বাহাদুর তাহা পরিপূরণের জন্য অগ্রসর হইয়া পিতৃ কীর্ত্তিকলাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। অন্যান্য স্বর্গত হিতৈষীর নাম নিম্নে বিবৃত হইল—

ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, পণ্ডিত দুর্গাসুন্দর স্মৃতি-ব্যাকরণ-মীমাংসা-তর্কতীর্থ, অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্, এ, (রঙ্গপুর শাখা পরিষৎ অনুষ্ঠিত বার্ষিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়াছেন) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ তর্কালঙ্কার, কবিবর দেবকুমার রায় চৌধুরী, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও বাগ্মী অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় পঞ্চানন এম, এ, বি, এল্, সি, আই, ই, (উত্তরবঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের জীবন প্রতিষ্ঠায় ইনিই নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ঐ প্রথম অধিবেশন ১৩১৫ সালে রঙ্গপুর নগরে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ইনি সভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন।) কৈলাসরঞ্জন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, এই সভায় প্রথমাবধি অন্যতম কর্ম্মী ছিলেন। তিনি পত্রিকাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইঁহার অকাল তিরোধানে এই সভার বিশেষতঃ রঙ্গপুরের সাহিত্য ক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে।

সদস্যসংখ্যা	আজীবন	বিশিষ্ট	অধ্যাপক	সহায়ক	সাধারণ	ছাত্র	মোট
১৩৩৬	১	৩	৫	২	১০২	২৭	১৪০

বিগত বর্ষের তুলনায় সদস্য সংখ্যা কম হইয়াছে। কারণ কয়েকজন সদস্য সভায় চাঁদা দেওয়া বহুদিন হইতে বন্ধ করায় কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদনক্রমে তাঁহাদের নাম সদস্য তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

অধ্যাপক সদস্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ মহাশয় প্রবন্ধ রচনা দ্বারা, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সভার সহকারী সম্পাদকরূপে নানাবিধ কার্য্য সম্পাদন

করিয়া এবং শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগছী বি, এ, মহাশয় পুঁথির তালিকা প্রস্তত প্রভৃতি কার্য্যে সাহায্য করিয়া উপকৃত করিয়াছেন।

চিত্রশালা—পরিষৎকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়, সদস্য শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগছী বি, এ, মহাশয়ের সহায়তায় প্রাচীন পুঁথির তালিকা প্রস্তত এবং পুঁথিগুলির সুসন্নিবেশ করিয়াছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ পুঁথিগুলির তালিকা না থাকায় উহার সুরক্ষার অন্তরায় এবং অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে আলোচনাদি করার অসুবিধা ছিল। এক্ষণে সে অভাব দূর হইল।

চিত্রশালা পরিদর্শন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডকটার মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম্, এ, বি, এল্, ডি, লিট্ (প্যারিস) কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের পারসী ভাষার অধ্যাপক মৌলভী মহম্মদ আবদুল হালিম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কাব্যতীর্থ এম্, এ. রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ, ডব্লিউ, এইচ্ নেলসন, ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অধ্যাপক কাশীনাথ দীক্ষিত এম্, এ, প্রভৃতি চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া প্রত্যেকেই সানন্দে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিষৎ মন্দির সংস্কার—আলোচ্য বর্ষে ৬৭/০ ব্যয়ে পরিষৎ মন্দির সংস্কৃত হইয়াছে। তৎসংলগ্ন এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলের ও পূর্ণ জীর্ণসংস্কার সাধিত হইয়াছে। উক্ত হলের সংস্কার কার্য্যে বিভাগীয় কমিশনার সাহেব বাহাদুর গভর্ণমেণ্ট তহবিল হইতে এককালীন দেড় শত টাকা দান করিয়াছেন।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—আলোচ্য বর্ষে ১৫শ ভাগ ১—৪ সংখ্যা পত্রিকা এবং উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ১১শ অধিবেশনের সচিত্র কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সচিত্র কার্য্যবিবরণ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় ১৪৪/০ সভার স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর বহন করিয়া সাহিত্যিকদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য সভার পক্ষ হইতে তাহার নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

পরিষৎ চিত্রশালার সংগ্রহ—

আলোচ্য বর্ষে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় একটি প্রস্তর নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া চিত্রশালায় রক্ষিত হইয়াছে। "ভ্রমর গীতা" নামক একখানি পুঁথি এবং ২৯ খানা মুদ্রিত গ্রন্থ উপহার পাওয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গ ও আসামের নানাস্থানে এখনও প্রাচীন শিল্পাদর্শ, ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাচীন পুঁথি ইত্যাদি অযত্নে অনুসন্ধিৎসুর অপেক্ষায় পড়িয়া রহিয়াছে। জাতীয়তার দিনে জাতীয় ইতিহাসের এই সব মহার্ঘ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ মন্দির পূর্ণ করার জন্য আমরা প্রত্যেককেই বিশেষতঃ ছাত্র বন্ধুদিগকে আহ্বান করিতেছি।

অধিবেশন—

আলোচ্য বর্ষে ৭টি মাত্র অধিবেশনে ৬টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে।

অধিবেশনের তারিখ	পঠিত প্রবন্ধ	লেখক বা লেখিকা
১ম অধিবেশন ১৫ বৈশাখ, ১৩৩৬ রবিবার	নারীশিক্ষা সমস্যা	শ্রীযুক্তা ইন্দুবালা দেবী
২য় অধিবেশন ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ রবিবার	দার্শনিকের লক্ষ্যপথ	শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
৩য় অধিবেশন— ২৩ আষাঢ়, ১৩৩৬ রবিবার	প্রাচীন ভারতে-বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগচী বি,এ
৪র্থ অধিবেশন— ১৯ শ্রাবণ, ১৩৩৬ রবিবার	তত্ত্ববিদ্যায় পতঞ্জলি	শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
৫ম অধিবেশন— ৩০ ভাদ্র, ১৩৩৬ রবিবার	ভট্টকুমারিল ও তাঁহার ধর্ম্মব্যাখ্যা	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৬ষ্ঠ অধিবেশন— ২৭ পৌষ, ১৩৩৬ শনিবার	দার্শনিক চার্ব্বাক	শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ
৭ম অধিবেশন— ১১ ফাল্গুন, ১৩৩৬ রবিবার		

ছাত্রসভা—

পরিষৎসংসৃষ্ট ছাত্রসভায় সদস্য সংখ্যা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ছাত্র সভার সম্পাদকগণের মধ্যে শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীমান্ হিমাংশুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় স্থানান্তরে যাওয়ায় এই সভার কার্য্য আলোচ্যবর্ষে তাদৃশ অগ্রসর হইতে পারে নাই। আগামী বর্ষের জন্য নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত এবং শ্রীযুক্ত অধ্যাপক বিমলাচরণ কাব্যতীর্থ এম্ এ ছাত্রাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র লাহিড়ী; শ্রীযুক্ত বিনয়কান্ত চৌধুরী ও বিভূতিভূষণ লাহিড়ী সম্পাদকদ্বয় জ্যোতিঃ সেন, পৃথ্বীশচন্দ্র দাশ গুপ্ত সহকারী সম্পাদকদ্বয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আশাকরি, আমাদের সঙ্গে ছাত্রবন্ধুগণ এবারে পূর্ণোদ্যমে জাতীয়তার মূলভিত্তি জাতীয় সাহিত্যের আলোচনায় অগ্রসর হইয়া ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ মধুময় করিয়া তুলিবেন।

পদক পুরস্কার—

আলোচ্য বর্ষ মধ্যে বিগত বর্ষের বিঘোষিত পুরস্কার প্রবন্ধাদি হস্তগত না হওয়ায় প্রতিশ্রুত

পদকাদি দেওয়ার সুযোগ ঘটে নাই। আগামী বর্ষে এ বিষয়ে অবহিত হওয়ার জন্য আমরা ছাত্রবন্ধুদিগকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

চতুর্ব্বিংশ ও পঞ্চবিংশ সাংবৎসরিক অধিবেশন—

আলোচ্যবর্ষ মধ্যে ২৯।৩০শে চৈত্র শনি ও রবিবার সুপ্রবীণ সাহিত্যিক "প্রবাসী" প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৪শ ও ২৫শ সাংবৎসরিক অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় দিবসে বরেণ্য সাহিত্যিক অতিথির সম্বর্দ্ধনার জন্য পরিষৎ মন্দির সংলগ্ন এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল হলে একটি প্রীতিসম্মিলনের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে স্থানীয় ব্যায়াম সমিতির সদস্যদিগের মোটরগাড়ী নিশ্চল করা প্রভৃতি নানারূপ ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা শ্রীযুক্ত সীতেশচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের "স্বরদ" যন্ত্র বাদন ও মহিলাবৃন্দ কর্ত্তৃক সুমধুর সঙ্গীতাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়ের দ্বারা আবৃত্তিকারীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করান হইয়াছিল। তাজহাট রাজবাড়ীতে সভাপতি মহাশয়ের থাকিবার ব্যবস্থাদি করা হয়। এই সাহিত্যিক অনুষ্ঠানের সাফল্যকল্পে ছাত্র সমাজ, সদস্যগণ, ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জীনিয়ার প্রমুখ কর্ম্মচারিগণ ও মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ বাহাদুর যথেষ্ট সাহায্য করায় পরিষদের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিতেছি।

আয়-ব্যয়—

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মোট আয়—	৬৩৬।৴০
গত বর্ষের তহবিল—	১৫৫৩৵৩
	২১৮৯॥৩
১৩৩৬ বঙ্গাব্দের সর্ব্ব প্রকার ব্যয়—	৮৫৮৸৴০
	১৩৩০॥৵৩

আলোচ্য বর্ষে সভা রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে তিনশত টাকা বৃত্তি যথারীতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তজ্জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর প্রমুখ সদস্যদিগের নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী,
সম্পাদক।

প্রত্নতত্ত্ব   ১৯-৪৩ সংখ্যা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রঙ্গপুর শাখা

ষড়বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে এই সভা সপ্তবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। নিম্নে এই সভায় ষড়বিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইল,—

সদস্য	আজীবন	বিশিষ্ট	অধ্যাপক	সহায়ক	ছাত্র	সাধারণ	মোট—
১৩৩৭	১	২	৫	৭	২৪	৮৫	১২৫

সদস্যের মৃত্যু—আলোচ্যবর্ষে পরিষদের অধ্যাপক সদস্য কাশীধামের সরকারী সংস্কৃত কলেজের ন্যায়ের সর্ব্বোচ্চ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের গত ৮ই চৈত্র (১৩৩৭) রবিবার ৫২ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ এই সভা দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছেন।

অধিবেশন—আলোচ্যবর্ষে ৭টি অধিবেশন হইয়াছে।

অধিবেশন	পঠিত প্রবন্ধ ও লেখক	প্রদর্শিত দ্রব্য ও প্রদর্শন
১ম অধিবেশন ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭ রবিবার	"রঙ্গপুরের প্রাচীন কবি কাজি হায়াৎ মামুদের কাব্য-পরিচয় শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগচী বি, এ,	প্রাচীন পুঁথি— অমরকোষ, জ্যোতিষ, কালনির্ণয়, প্রশ্নকৌমুদী, জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র, হোরাষট্‌ পঞ্চাশিকা। শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ বাগচী বি, এ।
২য় অধিবেশন ১৪ আষাঢ়, ১৩৩৭ রবিবার	শ্রাদ্ধতত্ত্ব শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন তর্কতীর্থ	শোকপ্রকাশ— রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের পরলোকগমনে।
৩য় অধিবেশন ২৫ শ্রাবণ, ১৩৩৭ রবিবার	বৈষ্ণব সাহিত্যে উপনিষদ্ প্রভাব শ্রীযুক্ত বাসুদেব সার্ব্বভৌম কাব্য-ব্যাকরণ সাংখ্যতীর্থ	শোক প্রকাশ— বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ সভাপতি রায় চুনীলাল বসু বাহাদুরের পরলোকগমনে সমগ্র বঙ্গের যে অপরিসীম ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।
৪র্থ অধিবেশন ২১ ভাদ্র, ১৩৩৭ রবিবার	মুহূর্ত্তচিন্তামণিগ্রন্থের সময় নিরূপণ ও গ্রন্থকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত জীবনী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	

৫ম অধিবেশন ২৩ কার্ত্তিক, ১৩৩৭ রবিবার	মঙ্গলবাড়ীর মূর্ত্তি অঙ্কিত শিবলিঙ্গ শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস
৬ষ্ঠ অধিবেশন ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ রবিবার	সুসঙ্গের গারোজাতির ইতিবৃত্ত ও ভাষা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
৭ম অধিবেশন ২৭ চৈত্র, ১৩৩৭ শুক্রবার	বেদব্যাস বা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস

আয়-ব্যয়—সভার সর্ব্বপ্রকার আয়—	৫৩৫৷৶৩
গতবর্ষের তহবিল—	১৬৩০৷৵
	২১৬৬।৩
বাদ সর্ব্বপ্রকার ব্যয়—	৫০৬৷৵
	১৬৫৯৷৶৩

শাখা পরিষৎ রঙ্গপুর জেলা বোর্ডের নিকট ২২৫৲ টাকা সাহায্য পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছে।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—আলোচ্যবর্ষে ১৬শ ভাগ ১ম-৪র্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে।

পদক পুরস্কার—বিগতবর্ষের বিঘোষিত পদক জন্য পুরস্কার প্রবন্ধ হস্তগত না হওয়ায় কাহাকেও পুরস্কার দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। সর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যিক মাত্রকেই প্রতি-যোগিতায় আহ্বান করা হইয়াছে।

পুস্তকালয়ের পুস্তক সংখ্যা—ধর্ম্ম ৫৪, ইতিহাস ৪১, গল্প সাহিত্য ৯, কাব্য ৬১, নাটক ৭, চিকিৎসা ও বিজ্ঞান ১৯, জীবনী ২০, ব্যাকরণ ও অভিধান ১২, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী ২৭, আর্য্য সমাজ গ্রন্থাবলী ২৯, বিবিধ ২৬, সংস্কৃত ২৬, ইংরাজী ৬৬ মোট ৪০৭।

প্রাচীন পুঁথি—১১৫টি গড়ায় বাঙ্গলা পুঁথি ৩৭৭ এবং ৩৪টি গড়ায় সংস্কৃত পুঁথি ৯৫ মোট সংখ্যা ৪৭২।

পরিষৎ মন্দির—বিগত বার্ষিক অধিবেশনের পূর্ব্বে পরিষৎ মন্দির এবং তৎসংলগ্ন এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করা হইয়াছিল। গভীর পরিতাপের বিষয়—গত ১৭ই আষাঢ় (১৩৩৭) তারিখের ভূমিকম্পের ফলে উক্ত মন্দির ও হলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ভূমিকম্পে ভগ্ন সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরাদির সংস্কার জন্য গভর্ণমেন্ট ৫০০৲ শত টাকা সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে ঐ টাকা হস্তগত না হওয়ায় বর্ষশেষ পর্য্যন্ত কোনও সংস্কার সাধিত হয় নাই।

চিত্রশালা—নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি পরিষদের চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে।

মূর্ত্তি—কক্ষের বাহিরে স্থাপিত "ত্রিবিক্রম" মূর্ত্তি। পাদমূলে লিপি আছে। বিষ্ণুমূর্ত্তি ৭টি। সকলগুলিই দণ্ডায়মান। দক্ষিণ পার্শ্বে চামরধারিণী এবং বামপার্শ্বে বীণাবাদিনী স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। সূর্য্যমূর্ত্তি ২টি। পার্শ্বে ২টি দণ্ড হস্তে পুরুষমূর্ত্তি। পাদদেশে ৭টি অশ্ব। মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি—দশভুজা। শবাসনা কালীমূর্ত্তি। কালীমূর্ত্তির সহিত সিংহ রহিয়াছে। স্বরূপ আবিষ্কৃত হয় নাই।

মনসামূর্ত্তি।

চতুর্ভুজা ধাতুমূর্ত্তি। পাদমূলে কুকুর আছে। স্বরূপ আবিষ্কৃত হয় নাই।

হনূমান।

গণেশ ও নবগ্রহ।

মুদ্রা—

ইণ্ডোগ্রীক্ মুদ্রা। এক পৃষ্ঠায় গ্রীক্ অক্ষরে ব্যাসিলিউস্ নিকিফোরা...অপর পৃষ্ঠায় অশ্বমূর্ত্তি অঙ্কিত।

ভেনিস দেশীয় স্বর্ণমুদ্রা। লাটিন ভাষায় লেখা আছে—"Dwx" অর্থ জমিদার।

শাহ আলম ২য়, মুরসিদাবাদে প্রস্তুত, হিজরী ১২০২।

ঐ ঐ ১২০৪।

ঐ টাকা।

ঐ টাকা ৭ টি।

ঐ দুয়ানি

শাহ আলম বাদসাহ টাকা

শাহ আলম শেখ বাদসাহ আধুলী

ঐ সিকি

ঐ দুয়ানি

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর সা স্বর্ণ টাকা।

আকবর সা টাকা।

সেকেন্দর সা টাকা।

জাহাঙ্গীর টাকা।

সাজাহান সাহাবুদ্দীন টাকা।

মহম্মদ শাহ।

মদিনার টাকা।

মক্কার টাকা (জাল) চতুষ্কোণ।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী টাকা।
ঐ আধুলী
ঐ দুয়ানি।
পর্ত্তুগীজ টাকা ১৮৮২
আলোয়ার ষ্টেট্
ফ্রান্স দেশীয় মুদ্রা ৫০ সেণ্ট।
চীন দেশের মুদ্রা।
শ্যাম দেশের মুদ্রা।
কোচবিহার শ্রীশ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ ২টি।
ঐ শ্রীশ্রীশিবেন্দ্র নারায়ণ ১টি।
ঐ শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর ৩৫৪ শকা।
আসামী সিকি—(অষ্টকোণাকৃতি) শ্রীশ্রীহরগৌরীপদ পরায়ণায়াঃ শাকে ১৬৪৮
শ্রীশ্রীশিবসিংহ নৃপমহিষী শ্রীফুলেশ্বরী দেব্যাঃ।
ঐ ... ... শ্রীশ্রীজয়ন্তীপুর পুরন্দরস্য শক ১৬৫৩
(দ্বিতীয় পার্শ্বে) অর্দ্ধচন্দ্রাদি।
ঐ ... ... কালিকা পদে শ্রীশ্রীযুত রত্ন মাণিক্য দেব
শ্রীভাগ্যবতী মহাদেব্যৌ
সিংহমূর্ত্তি শক ১৬০৭
ঐ ... ... শ্রীশ্রীহরগৌরী প......পরস্য (১ম পৃঃ)
শ্রীশ্রীগৌরীনাথ সিংহ নৃপস্য (২য় পৃঃ)
নেপালের মুদ্রা ৩টি ... পৃথিবীর বিক্রম (১ম পৃঃ)
শ্রীশ্রীগোরক্ষনাথ (২য় পৃঃ)
বৃত্তাকারে মধ্যদেশে "শ্রীভবানী"
লিপিযুক্ত প্রস্তর ফলক দুই খানি।
লিপিযুক্ত মৃন্ময় ইষ্টক দশখানি।

ইষ্টক সংগ্রহের মধ্যে কতকগুলির উপর শ্রীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। গরুড়ারূঢ় চতুর্ভুর্জ বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বলরাম, রাম, মৎস্যাবতার ও বরাহাবতার ও বামনাবতার আছে।

অপর একখানিতে ষড়্ভুজ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত আর কয়েকখানিতে নর্ত্তনশীলা নারীমূর্ত্তি ইত্যাদি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

গৌড় হইতে আনীত এনামেল করা ইষ্টকাংশ। ভবচন্দ্র পাট হইতে প্রাপ্ত সুবৃহৎ ইষ্টক। পীরগাছা বর্দ্ধন কুঠী হইতে প্রাপ্ত কারুকার্য্যযুক্ত নানাবিধ ইষ্টক। প্রাচীনকালের বন্দুকের নল। ক্ষুদ্র স্তূপের মস্তকভাগ। ইহার উপর কাল রঙ্গের একটি লেপ দেওয়া আছে। প্রস্তর নির্ম্মিত মকরাকৃতি পয়ঃপ্রণালী।

চিত্রশালা পরিদর্শন—

রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মাননীয় আর্ এন্ রীড্ আই, সি, এস্ স্কোয়ার এবং মিঃ জে, জি, ড্রামণ্ড স্কোয়ার; বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির লাইব্রেরী য্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার এম্ এ, বি, এল্; বরিশাল বাণীপীঠের হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত রসরঞ্জন সেন, আসাম গৌরীপুর তারিণীপ্রিয়া চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমানাথ গোস্বামী বিদ্যালঙ্কার, রঙ্গপুর বাগ্ দুয়ারের বাগ্ দেবীর সেবাইৎ শ্রীযুক্ত রাধাশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সভার চিত্রশালা পরিদর্শন করিয়া অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

চাঁদাবাকী—

১৩৩৭ চৈত্র পর্য্যন্ত সদরের সদস্যদিগের নিকটে ৫৯৪।০ এবং মফঃস্বল সদস্যগণের নিকটে ৬৩৩।০ মোট ১২২৭৸০ চাঁদা বাকী পড়িয়াছে—অর্থাৎ পরিষদের চাঁদা আদায় প্রায় এককালীন বন্ধ আছে। সমস্ত বৎসরে মাত্র ৬৷০ চাঁদা আদায় দ্বারা এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম পরিচালন এককরূপ অসম্ভব হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতে সাহায্য না পাইলে সভার কার্য্য স্থগিত রাখিতে হইত। আমরা এ বিষয়ে সদস্যদিগের বিশেষভাবে সদয়দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই কার্য্য-বিবরণ শেষ করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার নিয়মাবলী

১। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতত্ত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ সংগ্রহ, প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

২। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন পাঁচশত বা তদূর্দ্ধ পরিমিত অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা সভার আজীবন সদস্য ও পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবেন।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই এই সভার সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচনের পর নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে তৎসংবাদসহ একখানি "সদস্যপদ স্বীকারপত্র" স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সদস্যপদ স্বীকারপত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া ১৲ টাকা প্রবেশিকা (রঙ্গপুরবাসী উভয় সভার সদস্যের পক্ষে) বা চারি মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা (কেবল শাখা-সভার সদস্যের পক্ষে) সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে তাঁহাকে সদস্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৪। মূল ও শাখা পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উভয় সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ||০ আনা এবং শাখা পরিষদের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কেবল শাখা সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ।০ আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। উভয় সভার সদস্যগণ শাখা ও মূল সভার যাবতীয় অধিকারসহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন; শাখা-সভার সদস্যগণ শাখা-সভার যাবতীয় অধিকারসহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখা সভার সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার উভয় প্রকারের সদস্যগণেরই থাকিবে।

৫। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্যসেবায় রত থাকিয়া বিশেষভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও, এই সভার অধ্যাপক বা সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সদস্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোনও না কোনও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ।

৬। সদরের সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে মাস মাস বা বর্ষ মধ্য ও শেষভাগে চাঁদার খাতা পাঠাইয়া দিয়া চাঁদার টাকা গৃহীত হয়। মফঃস্বলের সদস্যদিগের নিকট বর্ষ মধ্য ও শেষভাগে ভি, পি, যোগে পত্রিকাদি পাঠাইয়া চাঁদার টাকা লওয়া হয়। এইরূপে বৎসরের চাঁদা বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া না দিলে কেহ পত্রিকাদি প্রাপ্তির ও অন্যান্য অধিকারের দাবী করিতে পারিবেন না। উভয় সভার সদস্যের দেয় অন্যূন ।৹ চাঁদার অর্দ্ধাংশ মূল সভা এবং অপরার্দ্ধাংশ শাখা সভা স্ব স্ব পত্রিকাদি উক্ত প্রকারে ভি, পি, যোগে প্রেরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মূল সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মূল সভা এবং শাখা-সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি শাখা সভা স্ব স্ব ব্যয়ে বিতরণ করিবেন।

৭। কেবল রঙ্গপুরবাসীর একত্রে মূল ও শাখা উভয় সভার সদস্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। যে সকল সদস্য ১৩২০ সালের পূর্ব্বে উভয় সভার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা রঙ্গপুরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহাদের উভয় সভার অধিকারাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৮। রঙ্গপুর শাখা পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়ম মূল সভার অনুরূপ।

সভা সম্পর্কীয় টাকা ও বিনিময় পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় সভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক,
রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ মন্দির, রঙ্গপুর।